Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১২তম বর্ষঃ	১ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪২৯ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪১৫ বাং
অক্টোবর	২০০৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধঃ**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার ১১
- ডঃ মাহফূযুর রহমান আখন্দ

❑ প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসের পাঁয়তারা ১৮
- নূরুল ইসলাম

❑ শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ ২৩
- আব্দুল ওয়াদূদ

❑ প্রসঙ্গঃ নারীর সমঅধিকার ২৭
- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

✡ চিকিৎসা জগতঃ ৩০
♦ টাইফয়েড জ্বর : চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

✡ ক্ষেত-খামারঃ ৩১
♦ বাংলাদেশের ফলের পুষ্টি ও ভেষজগুণ

✡ **কবিতাঃ** ৩২
♦ সৎকর্ম ♦ খুশীর ঈদ
♦ পর্দা ♦ বিজয়ের শর্ত

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৪

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৫

✡ **মুসলিম জাহান** ৩৯

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪০

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

Contents

আলোর পথ

মানুষকে আল্লাহ জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তার জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য ইবলীসকে পাঠিয়েছেন। তাকে অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন বিভিন্ন যুক্তিতর্কে ও প্রলোভনে মানুষকে তার সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক থেকে বিভ্রান্ত করতে। বান্দা যেন শয়তানের ফাঁদে পড়ে বিপথে না যায় সেজন্য আল্লাহ দয়া করে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত সমূহ প্রেরণ করেছেন। যারা তার অনুসরণ করবে তারা সুপথে থাকবে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা শয়তানের তাবেদার হবে। মূলতঃ এটাই হ'ল পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে এবং পরকালে জান্নাত-জাহান্নাম নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ্র দেখানো পথ হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। যাকে হাদীছে 'উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ' *(আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭)* তথা আলোর পথ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের পথকে কুরআনে 'জাহেলিয়াত' ও 'যুলুমাত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৪, মায়েদাহ ৫/৫০; বাক্বারাহ ২/২৭৭)* অর্থাৎ মূর্খতা ও অন্ধকারের পথ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি সোজা রাস্তা, যার দু'পাশে খাড়া প্রাচীর রয়েছে। তাতে খোলা দরজা সমূহ রয়েছে। যাতে পর্দা ঝুলানো আছে। রাস্তার মাথায় একজন আহ্বানকারী আছেন, যিনি লোকদের ডেকে বলছেন, তোমরা সোজা পথ ধরে এসো, আঁকাবাঁকা পথে নয়। তার উপরে আরেকজন আহ্বানকারী আছেন যে সর্বদা তাকে আহ্বান করে। যখনই বান্দা ডান-বামের দরজা খুলতে চেষ্টা করে, তখনই তাকে ডাক দিয়ে বলে, সর্বনাশ দরজা খুলো না। কেননা একবার খুললেই তুমি তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর উদাহরণটির ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সরল পথটি হ'ল 'ইসলাম'। খোলা দরজাগুলি হ'ল আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। ঝুলানো পর্দাগুলি হ'ল আল্লাহর সীমারেখা সমূহ। রাস্তার মাথায় আহ্বানকারী হ'ল 'কুরআন'। আর তার উপরে আহ্বানকারী হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উপদেশদাতা, যা প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে বিরাজ করে' *(আহমাদ হা/১৭৬৭১; মিশকাত হা/১৯১, সনদ ছহীহ)*। এই উপদেশদাতাকে কুরআনে 'নফসে লাউয়ামাহ' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* অর্থাৎ তিরস্কারকারী নফস বলা হয়েছে। এটাই হ'ল সুস্থ বিবেকের তাড়না বা কষাঘাত। যদি আল্লাহ এটা না করতেন, তাহ'লে সারা পৃথিবীতে শয়তানের একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম হয়ে যেত। বিবেক ও মনের দ্বন্দ্বে যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, কুরআন ও হাদীছ তথা আল্লাহ্র অহী তখন তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। এর বাইরের পথ দুনিয়াবী প্রলোভনের পথ, তাগূত ও শয়তানের পথ। যারা দুনিয়ায় মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি চায়, তারা অহীর পথ আঁকড়ে ধরে থাকে এবং শয়তানী ধোঁকা হ'তে দূরে থাকে।

বিভিন্ন নামে ও মুখোশে শয়তান যুগে যুগে তার প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। কখনো শয়তান সাময়িকভাবে জয়ী হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে সে সর্বদা পরাজিত। তার কৌশল সর্বদা দুর্বল *(নিসা ৪/৭৬)*। বিগত যুগের 'আদ, ছামূদ, নমরূদ ও ফেরাউনরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, এযুগের ফেরাউনরাও তেমনি সর্বদা মার খাচ্ছে ও খাবে। কিন্তু শয়তানের তাবেদাররা এগুলো অনুধাবন করতে চায় না। তারা সিডর-নার্গিস, ঝড়-বন্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এবং যালেম নেতা-নেত্রীদের চূড়ান্ত পরিণতিকে রাজনৈতিক বিপর্যয় বলে। এসবের পিছনে আল্লাহ্র নির্দেশ যে কার্যকরী আছে, সেকথা এরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না।

সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপর দিয়ে যে নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেল, তাতে নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের সাময়িক কষ্ট হ'লেও তাদের ঈমান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে তারা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের ঈমানের পরীক্ষা বলে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে তারা পরকালে নাজাতের আশা করেন। তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের হৃদয়ের কান্না শুনেছিলেন। ফলে নির্যাতনকারীদের উপরে আল্লাহ্র যে কঠোর শাস্তি ও মর্মান্তিক দুনিয়াবী গযব নেমে এসেছে এবং যা এখনও অব্যাহত রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে কোন দেশে আছে কি? বাংলাদেশে এমন কোন রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, যারা ওদের টুঁটি চেপে ধরতে পারত। তাই ঈমানদার মযলূমদের পক্ষে আল্লাহ নিজ হাতেই ওদের দমন করেছেন। এরপরেও কি লোকদের চোখ খুলবে না?... বস্তুতঃ ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আল্লাহ্র দায়িত্ব *(রূম ৩০/৪৭)*।

ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রকৃত ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য শত্রুরা নিত্যনতুন মতবাদের জন্ম দেয় ও মুসলিম দেশগুলিতে তার পরীক্ষা চালায়। এজন্য তারা ব্যয় করে অঢেল অর্থ। তাদের সর্বোচ্চ থিংক ট্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট (২০০৭) অনুসারে, পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পার্টনার হ'ল মুসলমানদের মধ্যকার চারটি দল : ধর্মনিরপেক্ষ (Secularists), উদারপন্থী (Liberals), মডারেট সুন্নী (Moderate traditionalists) এবং ছূফী (Sufis)। এখানে 'মডারেট' বলতে ঐসব সুন্নীদের বুঝানো হয়েছে, যারা সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। যাদের নিকট সবকিছুই হযমযোগ্য। তাদের ভাষায় They are natural allies of the west অর্থাৎ 'তারা হ'ল পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক মিত্র'। অপরদিকে তারা সালাফীদের 'মৌলবাদী' (Fundamentalists) বলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্য সকল দলকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করার জন্য মার্কিন সরকারকে ও পাশ্চাত্য শক্তিবলয়কে পরামর্শ দিয়েছেন। দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই রিপোর্টে সালাফীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার সত্ত্বেও এক স্থানে গবেষকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, Over the long term, the social costs of the spread of the salafi movement to the masses would be very high. অর্থাৎ 'দূর ভবিষ্যতে সালাফী দাওয়াত প্রসারের সামাজিক মূল্য জনগণের মাঝে অতি উচ্চে অবস্থান নিবে'। শুধু তাই নয়, রিপোর্টের শেষে পাশ্চাত্যের পোষ্য কিছু মুসলিম নামধারী লোকদের দিয়ে মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়েছে অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসার জন্য। আর আহ্বানকারী হিসাবে যে ১২ জনের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে আছে তাসলীমা নাসরীন, সালমান রুশদী, মারিয়াম নামাযী, মেহদী মুযাফফরী, আইয়ান হিরসী আলী প্রমুখ ধিকৃত লোকগুলি।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একমাত্র সালাফীরাই আছে অন্ধকারে। বাকী সব মুসলিম দল ফিরে গেছে তাদের দেখানো তথাকথিত আলোর পথে। আসলে কি তাই? অথচ ইসলামে মডারেট ও মৌলবাদী বলে কোন ভাগ নেই। কুরআন ও হাদীছের যথার্থ অনুসারী ব্যক্তিই হ'লেন প্রকৃত মুসলিম। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপরে নেমে এসেছে নির্যাতনের স্টীম রোলার বিদেশী শক্তিবলয়ের স্বার্থরক্ষাকারী এদেশীয় সরকারের মাধ্যমে। তাই এ মুহূর্তে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ঈমানদার ভাইদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা নির্যাতনের ভয়ে শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিবেন? নাকি নিজ আক্বীদা ও আমলের উপরে দৃঢ় থাকবেন? তারা সুদৃঢ় সাংগঠনিক ঐক্যের মাধ্যমে বাতিল শক্তির মুকাবিলা করবেন, নাকি শয়তানী মতবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবেন? এরূপ কঠিন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যেকথা শুনিয়েছিলেন, আমরাও আমাদের সাথী ভাই-বোনদের সেকথা শুনাতে চাই। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। আমরা সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করি। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেখানো পথকেই আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ মনে করি। শয়তানের দেখানো আঁকাবাঁকা পথে আমরা যেতে চাই না। যুগের পরিবর্তনে ইসলামের কোন পরিবর্তন হয় না। বরং ইসলাম যুগকে পরিবর্তন করে। এটাই হ'ল চিরন্তন আলোর পথ। আর এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। বাকী সবই অন্ধকারের পথ। যার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে সুদৃঢ় রাখুন- আমীন!

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকাঃ

আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে স্থিতি দান করেন। তিনি তাদেরকে অসহায় ও লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*। বরং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে প্রথম মানুষ আদমকে তাঁর বংশধরগণের হেদায়াতের জন্য প্রথম 'নবী' হিসাবে প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ৩৮-৩৯)*। এভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হন। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তালূতের সাথী সংখ্যা ছিল ৩১৩ এবং বদরের যুদ্ধে শেষনবীর সাথী ছিলেন ৩১৩, ক্বিয়ামতের পূর্বে আগমনকারী ইমাম মাহদীর সাথী হবেন ৩১৩। এর মধ্যে আল্লাহ্র কোন রহস্য থাকতে পারে। বহু নবীর নিকটে আল্লাহ পাক ছহীফা বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শরী'আত বা জীবন বিধান। তবে চার জন রাসূলের নিকটে আল্লাহ প্রধান চারটি কিতাব প্রদান করেন। যথাক্রমে মূসা (আঃ)-এর উপরে 'তাওরাত', দাঊদ (আঃ)-এর উপরে 'যবূর', ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইনজীল' এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে 'কুরআন'। প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন বনু ইস্রাঈলের নবী এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত তিনটি কিতাব নাযিল হয়েছিল একত্রিতভাবে। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বনবী হিসাবে বনু ইসমাঈলে এবং শেষ কিতাব 'কুরআন' নাযিল হয়েছিল বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপরে দীর্ঘ ২৩ বছরের বিস্তৃত সময় ধরে মানুষের বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ও শেষ কিতাব নাযিলের পর বিগত সকল নবুঅত ও সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক হিসাবে কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনীত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনই বাকী রয়েছে। নিঃসন্দেহে রাসূলের ছহীহ হাদীছ সমূহ আল্লাহ্র অহী এবং কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা ও জীবন মুকুর বৈ কিছুই নয়। যা মুমিন জীবনের চলার পথে ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা পথ প্রদর্শন করে থাকে।

হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তাও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে। তবে কেবল নাম হিসাবে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন'আম ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াতে। কেবলমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাকী সকল নবীর কাহিনী সমগ্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন মূসা ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ বলেন, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. 'আমরা তোমার পূর্বে এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়েছি এবং এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাইনি...' *(নিসা ৪/১৬৪, মুমিন ৪০/৭৮)*।

আমরা বর্তমান আলোচনায় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্য সমূহ একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে বিশ্বস্ত তাফসীর, হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ থেকেও সামান্য কিছু উদ্ধৃত করেছি। চেষ্টা করেছি নবীদের কাহিনীর নামে প্রচলিত কেচ্ছা-কাহিনী ও ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ হ'তে বিরত থাকতে। সীমিত পরিসর ও সীমিত সাধ্যের কারণে অনাকাংখিত ত্রুটি সমূহ থেকে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মূলতঃ চারটি বংশধারা থেকে এসেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইব্রাহীম ও আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। যারা একে অপরের বংশধর ছিল ...' *(আলে ইমরান ৩/৩৩)*। ইবরাহীম পুত্র ইসহাক তনয় ইয়াকূব-এর অপর নাম ছিল ইস্রাঈল (অর্থ আল্লাহ্র দাস)। তাঁর পুত্র লাভী থেকে ইমরান পুত্র মূসা, দাঊদ ও ঈসা পর্যন্ত সবাই বনু ইস্রাঈলের নবী ছিলেন *(আনকাবূত ২৯/২৭)*। ইবরাহীমের অপর পুত্র ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এজন্য ইবরাহীম (আঃ)-কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বিশ্বে মাত্র দু'জন নবীর একাধিক নাম ছিল। তন্মধ্যে ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ইস্রাঈল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অপর নাম ছিল আহমাদ এবং আরও কয়েকটি নাম। আল্লাহ সকল নবীর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!!

উদ্দেশ্যঃ

প্রশ্ন হ'তে পারে, পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ দিয়েছেন, وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُل مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. 'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে এজন্য বর্ণনা করি, যদ্বারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' *(হূদ ১১/১২০)*। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নামঃ

আদম, ইদরীস, নূহ, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ুব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, যুলকিফ্ল, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এঁদের মধ্যে ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। আমরা এক্ষণে পরপর তাঁদের জীবনী ও তা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

১। হযরত আদম (আঃ)

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালামকে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও শুকনো ঠনঠনে মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেন *(মুমিনূন ২৩/১২; সাজদাহ ৩২/৭; ছাফফাত ৩৭/১১; রাহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি)*।

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[১] আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা স্রেফ ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে 'বিবর্তনবাদ' পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি মৃত মতবাদ মাত্র এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহ্র খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত *(লোকমান ৩১/২০)* ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব *(ইসরা ১৭/৭০)*। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لوكان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

'যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি বলে গণ্য হ'ত'।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপঃ

শয়তানকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। 'সে মানুষকে বলে কুফরী কর'। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান আর দায়িত্ব নেয় না। সে বলে 'আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্কে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[২] এবং বর্তমানে সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর 'ওয়ারিছ' হিসাবে[৩] আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকবে। শেষনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না।[৪] এতদসত্ত্বেও অবশেষে পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক থাকবে না, অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহ্র হুকুমে প্রলয় ঘনিয়ে আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[৫] মানুষের দেহগুলি সব মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু রূহগুলি স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীনে' অবস্থান করবে *(মুতাফফেফীন ৮৩/৭, ১৮)*। যা ক্বিয়ামতের পরপরই আল্লাহ্র হুকুমে স্ব স্ব দেহে পুনঃপ্রবেশ করবে এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য সকল মানুষ সশরীরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দরবারে নীত হবে।

---

১. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮।*

২. *আহমাদ, ত্বাবারানী, মিশকাত হা/৫৭৩৭।*
৩. *তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ হা/২১২।*
৪. *আহমাদ, মিশকাত হা/৪২।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬ 'ফিতান' অধ্যায়।*

অতএব পৃথিবী হ'ল সাময়িক পরীক্ষাগার মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ এই পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষা শেষে সুন্দর ফল লাভে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে, অথবা ব্যর্থকাম হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানেই হবে তাদের সর্বশেষ যাত্রাবিরতি এবং সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, 'মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর ঐ মাটি থেকেই আমরা তোমাদেরকে আমরা পুনরায় বের করে আনব' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)*। অতঃপর বিচার শেষে কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে এবং মুত্তাক্বীদের নেওয়া হবে জান্নাতে *(যুমার ৩৯/৬৯-৭৩)*। এভাবেই সেদিন যালেম তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে এবং মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। সেদিন কারু প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

এক্ষণে আদম সৃষ্টির ঘটনাবলী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার আলোকে সার-সংক্ষেপ আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

আদম সৃষ্টির কাহিনী

আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহ্র বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে।

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত সকল সৃষ্টবস্তুর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল। যা দিয়ে সৃষ্টবস্তু সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে। যদিও আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানরাশির সাথে মানবজাতির সম্মিলিত জ্ঞানের তুলনা মহাসাগরের অথৈ জলরাশির বুক থেকে পাখির ছোঁ মারা এক ফোঁটা পানির সমতুল্য মাত্র।[৬] বলা চলে যে, আদমকে দেওয়া সেই যোগ্যতা ও জ্ঞান ভাণ্ডার যুগে যুগে তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সন্তানদের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ও তার দ্বারা জগত সংসার উপকৃত হচ্ছে।

৬. *বুখারী হা/৪৭২৬, ৩৪০১।*

আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দেওয়ার পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। কুরআনে কেবল ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হ'লেও সেখানে জিনদের সদস্য ইবলীস উপস্থিত ছিল *(কাহফ ১৮/৫০)* অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন, জিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের উপরে আদম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হৌক এবং বাস্তবে সেটাই হ'ল। তবে যেহেতু ফেরেশতাগণ জিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সেজন্য কেবল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়াতে জিনদের ইতিপূর্বেকার উৎপাত ও অনাচার সম্বন্ধে ফেরেশতারা আগে থেকেই অবহিত ছিল, সেকারণ তারা মানুষ সম্বন্ধেও একইরূপ ধারণা পোষণ করেছিল এবং প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ জিন জাতিকে আগেই সৃষ্টি করেন গনগনে আগুন থেকে' *(হিজর ১৫/২৭)*। কিন্তু তারা অবাধ্যতা চূড়ান্ত করে।

আদমকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ঐসব বস্তুর নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা তা বলতে পারল না। তখন আল্লাহ আদমকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সবকিছুর নাম বলে দিলেন। ফলে ফেরেশতারা অকপটে তাদের পরাজয় মেনে নিল এবং আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়'। অতঃপর আল্লাহ তাদের সবাইকে আদমের সম্মুখে সম্মানের সিজদা করতে বললেন। সবাই সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যঃ

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের প্রতীক ও সকল মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল, قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. 'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' *(হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)*। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)*। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' *(আ'রাফ ৭/১৩)*। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[৭] আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য শয়তানের ধোকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন[৮] এবং বললেন, 'তোমরা দু'জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৪/৩৪)*। অতঃপর বহিষ্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসাবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হ'ল এই যে, তোমরা তাহ'লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী'। এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তাঁরা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করলেন। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং তাঁরা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগলেন। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে। তিনি আরও বল্লেন যে, তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে' *(আ'রাফ ৭/২০-২৫)*।

প্রথম বার শাস্তিমূলক বহিষ্কারের আদেশ দানের পরে পুনরায় স্নেহ ও অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই নেমে যাও'। অতঃপর পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা হওয়ার *(বাক্বারাহ ২/৩০; ফাত্বির ৩৫/৩৯)* মহান মর্যাদা প্রদান করে বললেন, 'তোমাদের নিকটে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে। যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা দুঃখের কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম (আঃ) ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ায় নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৫)*। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হেদায়াত প্রদান করেন' *(আ'রাফ ৭/১২২)*।

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮।*
৮. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮।*

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. 'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' *(হিজর ১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)*। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا. ' তোমরা নেমে যাও' *(বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)*। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

নগ্নতা শয়তানের প্রথম কাজঃ

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষের উপরে শয়তানের প্রথম হামলা ছিল তার দেহ থেকে কাপড় খসিয়ে তাকে উলঙ্গ করে দেওয়া। আজও পৃথিবীতে শয়তানের পদাংক অনুসারী ও ইবলীসের শিখণ্ডীদের প্রথম কাজ হ'ল তথাকথিত ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে উলঙ্গ করে ঘরের বাইরে আনা ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করা। অথচ পৃথিবীর বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছে মূলতঃ নারী ও মদের সহজলভ্যতার কারণেই। অতএব সভ্য-ভদ্র ও আল্লাহভীরু বান্দাদের নিকটে ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয হ'ল স্ব স্ব লজ্জাস্থান আবৃত করা ও ইযযত-আবরূর হেফাযত করা। অন্যান্য ফরয সবই এর পরে। নারীর পর্দা কেবল পোষাকে হবে না, বরং তা হবে তার ভিতরে, তার কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে সর্ব বিষয়ে। পারস্পরিক চৌম্বিক আকর্ষণের কারণে পরনারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর পর পুরুষের হৃদয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। অতএব লজ্জাশীলতাই মুমিন নর-নারীর অঙ্গভূষণ ও পারস্পরিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে একে অপরের থেকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে আনত রাখবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)* এবং পরস্পরে সার্বিক পর্দা বজায় রেখে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকু স্বাভাবিকভাবে সংক্ষেপে বলবে। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও পর্দা বজায় রেখে স্ব স্ব কর্মস্থলে ও কর্মপরিধির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সংসার ও সমাজের কল্যাণে সাধ্যমত অবদান রাখবে। নেগেটিভ ও পজেটিভ পাশাপাশি বিদ্যুৎবাহী দু'টি ক্যাবলের মাঝে প্লাষ্টিকের আবরণ যেমন পর্দার কাজ করে এবং অপরিহার্য এক্সিডেন্ট ও অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করে, অনুরূপভাবে পর নারী ও পরপুরুষের মধ্যকার পর্দা উভয়ের মাঝে ঘটিতব্য যেকোন অনাকাংখিত বিষয় থেকে পরস্পরকে হেফাযত করে। অতএব শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে আদি পিতা-মাতার জীবনে ঘটিত উক্ত অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়ার এই পঙ্কিল পরিবেশে বসবাসরত মানব জাতিকে আরও বেশী সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কুরআন ও হাদীছ আমাদেরকে সেদিকেই হুঁশিয়ার করেছে।

মানব সৃষ্টির রহস্যঃ

আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ. 'স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মিশ্রিত পচা কাদায় শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে 'মানুষ' সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরী করে ফেলব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় পড়ে যাবে' *(হিজর ১৫/২৮-২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকার-আকৃতি দান করেছেন যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞানী' *(আলে ইমরান ৩/৬)*। তিনি আরও বলেন, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ. 'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন একের পর এক স্তরে তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে' *(যুমার ৩৯/৬)*। তিনটি আবরণ হ'ল- পেট, রেহেম বা জরায়ু এবং জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আদম সৃষ্টির তিনটি পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মাটি দ্বারা অবয়ব নির্মাণ, অতঃপর তার আকার-আকৃতি গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে শক্তির আনুপতিক হার নির্ধারণ ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সবশেষে তাতে রূহ সঞ্চার করে আদমকে অস্তিত্ব দান। অতঃপর আদমের অবয়ব (পাঁজর) থেকে কিছু অংশ নিয়ে তার জোড়া বা স্ত্রী সৃষ্টি করা। সৃষ্টির সূচনা পর্বের এই কাজগুলি আল্লাহ সরাসরি নিজ হাতে করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অতঃপর এই পুরুষ ও নারী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে প্রথম যে যমজ সন্তান জন্ম দেয়, তারাই হ'ল মানুষের মাধ্যমে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব যুগল। তারপর থেকে এযাবত স্বামী-স্ত্রীর মিলনে মানুষের বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ'ল সকল জীবন্ত বস্তুর মূল *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হচ্ছে 'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm)। যাকে বলা হয় 'আদি প্রাণসত্তা'। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির মধ্যকার সকল রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন,

নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ'ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। তাহ'লঃ সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। কিন্তু এই সব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা 'প্রোটোপ্লাজম' তৈরী করা সম্ভব নয়। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের 'কণা' পরিলক্ষিত হয়নি। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদম থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমনঃ মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭)*। স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে *(দাহর ৭৬/২)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত লক্ষমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রানু থাকে। আল্লাহ্র হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্র হুকুমে। মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি। অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব নয়। মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিণ্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন বাপ-মায়ের স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ! সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম!!

পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম লাভের তথ্য কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জনতে পেরেছে মাত্র গত শতাব্দীতে ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিষ্টটল সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই। রাসূলের হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই মতকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে।[৯] কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে কার্যকর।

উল্লেখ্য যে, মাতৃগর্ভে বীর্য প্রথম ৬ দিন কেবল বুদ্বুদ হয়ে থাকে। তারপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। তিন মাসের আগে ছেলে বা মেয়ে সন্তান চিহ্নিত হয় না। চার মাস পর রূহ সঞ্চারিত হয়ে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মায়ের স্তন চুষতে অসুবিধা না হয়। এ সময় তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেওয়া হয়। তার আমল, হায়াত, রিযক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা।[১০]

এভাবেই জগতসংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী'। 'সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়, আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়গোড় সমূহকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮)*।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবলীসের কথায় সর্বপ্রথম হাওয়া প্রতারিত হন। অতঃপর তার মাধ্যমে আদম প্রতারিত হন বলে যে কথা চালু আছে কুরআনে এর কোন সমর্থন নেই। হাদীছেও স্পষ্ট কিছু নেই।

জান্নাত থেকে পতিত হবার পর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ألست بربكم 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? বনু আদমের কাছ থেকে এই বহুল প্রসিদ্ধ 'আহদে আলাস্ত' বা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিটি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল না'মান (وادى نَعْمَانَ) নামক উপত্যকায়, যা পরবর্তীকালে 'আরাফাত'-এর ময়দান নামে পরিচিত হয়েছে।[১১] এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র এবং তা সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল এখনও আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ পৃথিবী ও সৌরলোকের বাইরে দূরে বহুদূরে অগণিত সৌরলোকের সন্ধান দিয়ে কুরআন ও হাদীছের তথ্যকে সপ্রমাণ করে দিচ্ছে।

---

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩-৪৩৪ 'গোসল' অনুচ্ছেদ।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ 'তাক্বদীর' অনুচ্ছেদ।*
১১. *আহমাদ, মিশকাত হা/১২১ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস'' অনুচ্ছেদ।*

আদমের অবতরণ স্থলঃ

আদম ও হাওয়াকে আসমানে অবস্থিত জান্নাত থেকে নামিয়ে দুনিয়ায় কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে আদমকে সরনদীপে (শ্রীলংকা) ও হাওয়াকে জেদ্দায় (সঊদী আরব) এবং ইবলীসকে বছরায় (ইরাক) ও ইবলাসের জান্নাতে ঢোকার কথিত বাহন সাপকে ইস্ফাহানে (ইরান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন, আদমকে মক্কার ছাফা পাহাড়ে এবং হাওয়াকে মারওয়া পাহাড়ে নামানো হয়েছিল। এছাড়া আরও বক্তব্য এসেছে। তবে যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, সেকারণ এ বিষয়ে আমাদের চুপ থাকাই শ্রেয়।

আহদে আলাস্ত-র বিবরণ

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, কিছু লোক হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে সূরা আ'রাফ ১৭২ আয়াতের মর্ম জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'লে তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন।[১২] অতঃপর নিজের ডান হাত তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন। তখন তার ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল, তারা সব বেরিয়ে এল। আল্লাহ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দুনিয়াতে জান্নাতেরই কাজ করবে। অতঃপর তিনি পুনরায় তার পিঠে হাত বুলালেন, তখন সেখান থেকে একদল সন্তান বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এরা দুনিয়াতে জাহান্নামের কাজই করবে। একথা শুনে জনৈক ছাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহ'লে আর আমল করানোর উদ্দেশ্য কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন আল্লাহ কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন, এমনকি তার মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। পক্ষান্তরে যখন তিনি কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে দিয়ে জাহান্নামের কাজই করিয়ে নেন। এমনকি তার মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[১৩] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ডান মুষ্টির লোকগুলো ছিল সুন্দর চকচকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের ন্যায়। আর বাম মুষ্টির লোকগুলো ছিল কালো কয়লার ন্যায়'।[১৪]

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বলা হয়েছে, 'বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে' *(আ'রাফ ১৭২)*। অন্যদিকে হাদীছে বলা হয়েছে, 'আদমের পৃষ্ঠদেশ' থেকে- মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। আদম যেহেতু বনু আদমের মূল এবং আদি পিতা, সেহেতু তাঁর পৃষ্ঠদেশ বলা আর বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ বলা একই কথা। তাছাড়া আদমের দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে অসংখ্য বনু আদমকে বের করে এনে উপস্থিত করানো আল্লাহর জন্য বিচিত্র কিছুই নয়।

মানুষ যেহেতু তার ভাগ্য সম্পর্কে জানে না, সেহেতু তাকে সর্বদা জান্নাত লাভের আশায় উক্ত পথেই কাজ করে যেতে হবে। সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হ'লে বুঝতে হবে ওটাই তার তাকদীরের লিখন ছিল। বান্দাকে ভাল ও মন্দ দু'টি করারই স্বাধীন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতার কারণেই বনু আদম আল্লাহর সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আর একারণেই তাকে তার ভাল ও মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

এখানে আদমের ঔরস বলতে আদম ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের ঔরস বুঝানো হয়েছে। এখানে 'বংশধর' বলতে তাদের অশরীরী আত্মাকে বুঝানো হয়নি, বরং আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন ক্ষুদ্র অবয়ব সমূহকে বুঝানো হয়েছে, যাদের কাছ থেকে সেদিন সজ্ঞানে তাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আজকের বিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর ভিতরে গোটা সৌরমণ্ডলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বিরাটকায় বস্তুকে একটি ছোট্ট বিন্দুর আয়তনে দেখানো হচ্ছে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি উক্ত অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে সকল আদম সন্তানকে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেহে অণু-বিন্দুতে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া জ্ঞানসম্পন্ন না হ'লে এবং বিষয়টি তাদের অনুধাবনে ও উপলব্ধিতে না আসলে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ও অঙ্গীকার ঘোষণার কোন গুরুত্ব থাকে না।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, সৃষ্টির সূচনায় গৃহীত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা পরবর্তীতে মানুষের ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহ'লে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ফলাফলটা কি? এর জবাব এই যে, আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার রক্ত ও মানসিকতার প্রভাব যেমন যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষের মধ্যেই সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনিভাবে সেদিনে গৃহীত তাওহীদের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতির প্রভাব সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বই মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয় ও বিপন্ন অবস্থায় তার কাছে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তাই তো দেখা গেছে, বিশ্ব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম শাসক ও আল্লাহদ্রোহী ফেরাঊন ডুবে মরার সময় চীৎকার দিয়ে আল্লাহর উপরে তার বিশ্বাস ঘোষণা করেছিল' *(ইউনুস ১০/৯০-৯১)*। মক্কা-মদীনার কাফের-মুশরিকরা শেষনবীর

---

১২. *আয়াতটি হ'লঃ* وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. *'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'? তারা বলল, অবশ্যই। 'আমরা এ বিষয়ে অঙ্গীকার করছি' আর এটা এজন্য, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে, বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না'।*

১৩. *মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫; 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

১৪. *আহমাদ, মিশকাত হা/১১৯ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আধুনিক বিশ্বের নাস্তিকসেরা স্ট্যালিনকে পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে 'ওহ মাই গড' বলে চীৎকার করে উঠতে শোনা গেছে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির সূচনালগ্নে গৃহীত উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের বীজ বপন করে দিয়েছে। চাই তার বিকাশ কোন শিরকী ও ভ্রান্ত পদ্ধতিতে হৌক বা নবীদের দেখানো সঠিক তাওহীদী পদ্ধতিতে হৌক।

এ কথাটাই হাদীছে এসেছে এভাবে যে, مَـامِنْ مَوْلُـوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِـهِ اَوْ يُنَـصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّـسَانِهِ... 'প্রত্যেক মানবশিশুই ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-নাছারা বা মজূসী (অগ্নিউপাসক) বানায়'।[১৫] এখানে 'ফিৎরাত' অর্থ স্বভাবধর্ম ইসলাম। অর্থাৎ মানব শিশু কোন শিরকী ও কুফরী চেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং আল্লাহকে চেনা ও তার প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের আগ্রহ ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর ফলে নবীদের প্রদত্ত তাওহীদের শিক্ষাকে সে অত্যন্ত সহজে ও সাগ্রহে বরণ করে নেয়। কেননা শুধু জন্মগত চেতনার কারণেই কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। যতক্ষণ না সে নবীর মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কবুল করে।

ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَإِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَـنْ دِيْـنِهِمْ... 'আল্লাহ বলেছেন, যে আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ' রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তার পিছে লেগে তাকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে নিয়ে গেছে। =*(মুসলিম হা/২৮৬৫ 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬; আহমাদ হা/১৬৮৩৭)*। আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللَّـهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا لَـا تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ 'আল্লাহ্র ফিৎরত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র এই সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*।

মোট কথা প্রত্যেক মানবশিশু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার অনুভূতি ও যোগ্যতা নিয়ে সৃষ্টি হয়। যদিও পিতা-মাতা ও পরিবেশের কারণে কিংবা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পরবর্তীতে অনেকে বিভ্রান্ত হয়। অতএব কাফির-মুমিন-মুশরিক সবার মধ্যে আল্লাহকে চেনার ও তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের চেতনা ও যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। এই সৃষ্টিগত চেতনা ও অনুভূতিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ কুশিক্ষা, কুসঙ্গ ও শয়তানী সাহিত্য পাঠ করে বা নষ্ট ব্লু ফিল্মের নীল দংশনে উক্ত চেতনাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা আল্লাহ্র সৃষ্টির সঙ্গে বিদ্রোহ করার শামিল। অতএব উক্ত সৃষ্টিগত চেতনাকে সমুন্নত রাখাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

একথা ব্যক্ত করে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالْـإِنسَ إِلَّـا لِيَعْبُـدُونِ. 'আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ আমি তার প্রকৃতিতে আমার প্রতি ইবাদত ও আনুগত্যের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। এটাকে সঠিক অর্থে কাজে লাগালে আমার অবাধ্যতামূলক কোন কাজ বান্দার দ্বারা সংঘটিত হবে না এবং জগতসংসারেও কোন অশান্তি ঘটবে না। যেমনভাবে কোন মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার কানে আযান শোনানো হয়। অথচ ঐ শিশু আযানের মর্ম বুঝে না বা বড় হয়েও তার সেকথা মনে থাকে না। অথচ ঐ আযানের মাধ্যমে তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায় তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদতের বীজ। যার প্রভাব সে আজীবন অনুভব করে। সে বে-আমল হ'লেও 'ইসলাম'-এর গণ্ডী থেকে খারিজ হয়ে যেতে তার অন্তর কখনোই সায় দেয় না। তার অবচেতন মনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বোধ অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষ করে হতাশা ও বিপন্ন অবস্থায় সে তার প্রভুর সাহায্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অর্থ না বুঝলেও কুরআন পাঠ ও আযানের ধ্বনি মানুষের মনকে যেভাবে আকৃষ্ট করে এবং হৃদয়ে যে স্থায়ী প্রভাব ফেলে তার কোন তুলনা নেই। একারণেই কাফির আরব নেতারা মানুষকে কুরআন শুনতে দিত না। অথচ নিজেরা রাতের অন্ধকারে তা গোপনে আড়ি পেতে শুনত এবং একে জাদু বলত। শ্রেষ্ঠ আরব কবিগণ কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এমনকি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ কুরআন শোনার পর কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেন। গত শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে খেলাফত উৎখাত করে কামালপাশা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদ সমূহে আরবী আযান বন্ধ করে তুর্কী ভাষায় আযান দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু তাতে আরবী আযানের প্রতি মানুষের হৃদয়াবেগ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি উক্ত আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হন।

আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শব্দের প্রভাব মানব মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাই আল্লাহ প্রেরিত আযানের ধ্বনি সদ্য-প্রসূত শিশুর কচি মনে আজীবনের মত সুদূরপ্রসারী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে-এটাই স্বাভাবিক। অতএব সৃষ্টির সূচনাকালের গৃহীত 'আহদে আলাস্ত' বা আল্লাহ্র প্রতি ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি মানব মনে জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যার কথা বারবার বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এবং যার বিরোধিতা করা আত্মপ্রবঞ্চনা করার শামিল।

১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার

*ডঃ মাহফুযুর রহমান আখন্দ**

জীবনের উষালগ্ন থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বকালের, সকল দেশের, সকল মানুষের ন্যূনতম সর্বজনস্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারের নামই 'মানবাধিকার' (Human Rights)। একে দলন বা হরণ করার অধিকার কারো নেই।[১] আধুনিক বিশ্বে এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আলোচিত হ'লেও মিয়ানমারের মুসলমানরা ১৯৪২ সাল থেকে অদ্যাবধি এর কোন সুফল পায়নি। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী মিয়ানমার (বার্মা) বৃটিশ শাসনমুক্ত হবার পর উ' নু'র শাসনামলে মুসলমানরা তাদের নাগরিক অধিকার ফিরে পাবার কিছুটা পরিবেশ পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকে সামরিক জান্তা কর্তৃক শাসিত হবার কারণে গোটা মিয়ানমারেই (বার্মা) বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কমবেশী নির্যাতিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অংসান সুচিসহ অসংখ্য নেতা-কর্মী সামরিক জান্তার কাছে যিম্মী হয়ে পড়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হচ্ছে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলমানরা। মিয়ানমার সরকার ও স্থানীয় মগরা রোহিঙ্গাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জবরদস্তি শ্রম, নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদকরণসহ মানবাধিকার হরণের মত সব ধরনের অপতৎপরতা চালায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা স্বদেশভূমি ত্যাগ করে একাধিকবার[২] বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এ প্রবন্ধে শুধুমাত্র ১৯৯১-৯২ সালে সংঘটিত আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট, পেশাজীবী, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও আশ্রায়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিওসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলাদেশী কর্মকর্তা, ওলামা, আমলা ও রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণীর সচেতন জনগোষ্ঠীকে ৮ ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগ হতে ৫ জন নিয়ে মোট ৪০ জনের নিকট থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নের দ্বারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বোপরি সরেজমিন ও ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মোতাবেক গবেষণা চালিয়ে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের মানবাধিকার পরিস্থিতি উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

মুসলিম বসতি উচ্ছেদ ও মগ প্রত্যাবাসনঃ

কোন ব্যক্তিকে তার বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু আরাকানের মগসেনারা[৩] স্থানীয় মগদের সহায়তায় সরকারী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে নির্বিঘ্নে এধরনের অমানবিক আচরণ করে ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদপূর্বক মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মগদের এনে সে স্থানে পুনর্বাসন করে।[৪]

বর্মী সমাজতন্ত্রী সামরিক জান্তা শুধুমাত্র ১৯৯২ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসেই দক্ষিণমংডুর ৫টি গ্রাম যথা- আংডাং, বসরাপাড়া, চকপেংডু, কোয়েশ্চ ও কুল্লুমে ৫৬টি মগ পরিবারকে অন্য স্থান থেকে এনে মুসলমানদের জমিতে পুনর্বাসিত করে।[৫] এ সময় মগদের বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য বিভিন্ন খরচ যোগানোর সাথে সাথে কারিগর-মিস্ত্রি ও কাজের মেয়ে পর্যন্ত মুসলমানদেরই যোগাতে হয়েছিল। সেইসাথে একই সময়ে মংডুর উত্তরে ১০টি মুসলিম পল্লীতে মগবসতি স্থাপন, ক্যাম্প নির্মাণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সামরিক রসদপত্র বহনের জন্য বর্মী বাহিনীর নির্দেশে সেখানে দৈনিক ১০০ জন মিস্ত্রি-কারিগর, ৩০০ জন কুলি এবং ৪০ জন মহিলাকে খাটানো হয়েছিল। এমনকি সেখানকার প্রত্যাবাসিত মগদের জন্য স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে প্রতিদিন দু'বেলায় প্রয়োজনীয় তরিতরকারীসহ আহার্যদ্রব্য সামগ্রীর যোগান দিতে হত।[৬]

বাধ্যতামূলক (জবরদস্তি) শ্রমঃ

শ্রমের মূল্য পাওয়া শ্রমিকের অধিকার এবং শ্রম যোগানের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাধীনতা আইনসিদ্ধ। কিন্তু আরাকানে রোহিঙ্গা শ্রমিকের শ্রম বিনিয়োগে যেমন স্বাধীনতা নেই, তেমনি শ্রমের মজুরী পাবার নিশ্চয়তাও অকল্পনীয়।[৭] সেখানে মগ সেনারা সরকার বিরোধী ও দেশদ্রোহী

---

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মোঃ মাহবুব-উল-হক জোয়ার্দার, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃঃ ১।*

২. *আরাকানের মুসলমানরা ১৯৪২, ১৯৫৬, ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে শাসকগোষ্ঠী ও স্থানীয় মগদের অমানবিক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে পৈতৃক বসতবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্যাপকভাবে শরণার্থী হিসাবে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। [বিস্তারিত দ্রঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান, "রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪," এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০]*

৩. আরাকানের সেনাবাহিনীতে মগ ছাড়াও বর্মী, কারেন, কাচিনসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক রয়েছে। এদের মধ্যে মগরা বেশী মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

৪. *Asia Watch*, "Burma : Rape, ForcedS Labour..." May 1992; *Amnesty International*, Human Rights Violations Against Muslim" May 1992; *দৈনিক বাংলা*, ২৯-৩০ জানুঃ ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ও ১৪ মার্চ ১৯৯১ এবং ৮ এপ্রিল ১৯৯২।

৫. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২।

৭. মোঃ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৮) পৃঃ ৬৮।

তৎপরতার অভিযোগে রোহিঙ্গা পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলকে রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেনাক্যাম্প তৈরী, যুদ্ধ-বিমান ঘাটি নির্মাণ, মাটিকাটা, যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ বহনসহ বিভিন্ন কাজের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে থাকে।[৮] কেউ শ্রম দানে অস্বীকার করলে বা মজুরী দাবী কিংবা প্রতিবাদ করলে সেনারা তাদেরকে গাছের সাথে বেঁধে শরীরে গরম পানি ঢেলে দেয় এবং নাকের ভিতর উত্তপ্ত লোহার রড ঢুকিয়ে অবর্ণনীয় পাশবিক নির্যাতন চালায়।[৯] কেউ শ্রমদানে অপারগ হ'লে চোখ উপড়ে নেয়া, নখের ভিতর সূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া এবং দেহের জোড়ায় আঘাত করে বিকলাঙ্গ করে ফেলার মত অমানবিক নির্যাতন করা হয়।[১০]

চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপঃ

যে কোন নাগরিক স্বদেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিনা বাধায় চলাচল করবে এটা তার মৌলিক অধিকার। সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হেতু ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি কাজের জন্য দেশের রাজধানী শহরের প্রতি সকল সচেতন জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অথচ মুসলমানদেরকে রাজধানী শহরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থাৎ এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে, এক থানা হ'তে অন্য থানায়, কিংবা অন্য শহরে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী নিষেধাজ্ঞা জারী করে রেখেছে।[১১] এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে হ'লেও প্রশাসনের নিকট থেকে পাস নিতে হয়।[১২] ১৯৯১ সাল থেকে নিজেদের কৃষি জমিতে চাষাবাদ করা, নদীতে মাছ ধরা, হাট-বাজার করা, স্কুল-কলেজে যাওয়া, মসজিদে ছালাত আদায় করা এমনকি বাড়ির সম্মুখস্থ পুকুরে গোসল করতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও মগ সেনারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[১৩] ফলে তারা যেন নিজ বাড়ীতে কারাজীবন যাপন করছে।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণঃ

বর্মী জান্তার সব ধরনের নির্যাতন রোহিঙ্গাদেরকে নীরবে সহ্য করতে হয়, প্রতিবাদ করলে সরকারীভাবে তাদের ব্যাংক একাউন্ট যব্দ (seize) করাসহ স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।[১৪] ১৯৯২ সালের মে মাসের মধ্যেই রোহিঙ্গাদের বসতি, মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থানে মগ সেনা এবং লুনথিন (বর্ডার পাহারারত মিলিটারি) বাহিনীর প্রায় সাড়ে ৩'শ স্থায়ী-অস্থায়ী ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে।[১৫] সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নীতির কারণে বিত্তশালী রোহিঙ্গারা উপায়ান্তর না দেখে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে থাকে। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই বিত্তশালী মুসলমানরা দেশান্তরিত হওয়ায় আরাকানে বসবাসকারী গরীব-অশিক্ষিত রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড আরো ভেঙ্গে পড়ে।

মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়ঃ

সরকারী মদদে মুক্তিপণ আদায়ের বিনিময়ে নির্যাতন থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং সম্পত্তি জবরদখল পূর্বক চাঁদা আদায় স্থানীয় বেসামরিক মগ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের আর এক অভিনব কৌশল। তাদের নির্যাতন থেকে জীবন বাঁচাতে একজন পুরুষের জন্য ৫ থেকে ২০ হাযার কীয়াট (বর্মী মুদ্রা) পর্যন্ত এবং একজন নারীর জন্য ৫ জন পুরুষ শ্রমিক মুক্তিপণ হিসাবে দিতে হয়।[১৬] তারা ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মাত্র ৪ মাসে রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় আড়াই কোটি কীয়াট মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায় করেছে।[১৭] রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে মাত্র চার মাসে এই আড়াই কোটি কীয়াট মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়ের ঘটনাই প্রমাণ করে, প্রতি বছর কত টাকা চাঁদা ও মুক্তিপণ আদায় করা হয় এবং এতে রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক অবস্থাই বা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

গ্রেফতার-অপহরণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন ও হত্যাঃ

বার্মার স্লোর্ক (ঝঃধঃব খধি ধহফ ঙৎফবৎ জবংঃড়ৎধঃরড়হ ঈড়হপরষ) কর্মকর্তা, সামরিক গোয়েন্দা, সেনাবাহিনী,

---

৮. *Asia Watch*, "Burma : Rape, Force Labour..." May 1992; *Amnesty International*, Human Rights Violations Against Muslim" May 1992; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২৩ মার্চ ও ২০ মে ১৯৯২। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে বর্মী সামরিক জান্তা পার্বত্য আরাকানের কিয়ক্ত থেকে পলেওয়া পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার ব্যাপী গিরিপথ তৈরীর জন্য প্রায় ১০ হাযার রোহিঙ্গা যুবককে নির্দয়ভাবে খাটায়।

৯. *দৈনিক মিল্লাত*, ৮ জুন ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ জুন ১৯৯১।

১০. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মার্চ ১৯৯২।

১১. The Return of the Rohingya Refugees to Burma : Voluntary Repatriation or Refoulement? *US Committee for Refugees*, Washington, March 1995, p. 3.

১২. *দৈনিক আজাদ*, সম্পাদকীয়, ২৫ মে ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ এবং ২৫ মে, ১৯৯১।

১৩. *দৈনিক মিল্লাত*, ১২ জানুয়ারী ১৯৯২; *New Straits Times*, 11 Nov., 1992.

১৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬ জানু: ১৯৯২; *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২৬ জানু:, ১৯৯২ এবং *দৈনিক দিনকাল*, ২৫ জানু:, ১৯৯২।

১৫. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০ মে: ১৯৯২।

১৬. বুচিদং টাউনশীপের ৩ মাইল উত্তরে চোফেরাং গ্রামের হামিদ হোসেন (৩০) রেঙ্গুন হাসপাতালে চোখের গুরুতর অপারেশন সেরে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসার সাথেই বর্মীবাহিনী তার বাড়ীতে হানা দিয়ে দোষারোপ করে বলে যে, সে রেঙ্গুন যাবার নাম করে থাই সীমান্তে গেরিলাদের সাথে শলা-পরামর্শ করেছে। বর্মীবাহিনী অসুস্থ হামিদকে ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হ'লে তার আরীয়-স্বজন ক্ষমা প্রার্থনা করে ২০ হাযার কীয়ট নগদ মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পায় এবং টংবাজার এলাকার অদূরে কাউনবাজার গ্রামের মৌলভী মোজাফফরের কাছে মগসেনারা মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবী করলে তিনি চাহিবা মাত্র পরিশোধ না করতে পারায় সৈন্যরা তাকে টংবাজার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে একমাস আটক রাখে এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনের পর তার দাড়ি উপড়ে ফেলে। [*দৈনিক জনতা*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৯২।]

১৭. *দৈনিক জনতা*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১ ও *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ এপ্রিল ১৯৯২।

আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ ও ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা বিনা অভিযোগে অতর্কিতভাবে দিনে রাতে অভিযান চালিয়ে হাযার হাযার রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে এবং নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যসহ লক্ষ লক্ষ কীয়াট মূল্যের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই এক রাতে তারা আরাকানের বিভিন্ন শহর-গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ শতাধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করে এবং লক্ষাধিক কীয়াট মূল্যের সম্পদ লুট করে। রোহিঙ্গা বন্দীদেরকে সেনানিবাসের ছোট কুঠরিতে গাদাগাদি অবস্থায় রেখে ইলেকট্রিক শক ও বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়। অনেককে পিন পুঁতে রাখা বোর্ডের ওপর দিয়ে হাটতে বাধ্য করা হয়, অনেকের গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের সেক দেয়া হয় এবং কাউকে শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। অসুস্থ আধমরা রোহিঙ্গা যুবকরা যখন ছালাতে রত হয় তখন নির্যাতনকারীরা তাদের পেছন থেকে পেটাতে থাকে এবং ক্রুর হাসি হেসে বলে, 'কোথায় তোদের আল্লাহ'? তাকে এসে তোদের রক্ষা করতে বল'।[১৮] এছাড়া ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর হ'তে ১৯৯২ সালের ১১ জানুয়ারী মাত্র ২২ দিনে আরাকান থেকে প্রায় ২১ হাযার রোহিঙ্গা যুবক এবং পাঁচ হাযার যুব মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে।[১৯]

বর্মীজান্তা গ্রেফতারকৃত হাযার হাযার রোহিঙ্গাকে জেলখানায় গাদাগাদি করে রেখেও জায়গা না পেয়ে অবশেষে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি খাদ্য গুদামে প্রায় ২ যাহার ৮শ' রোহিঙ্গাকে তালাবদ্ধ করে রাখে। ফলে ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষুধা, অনাহার ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক হাযার রোহিঙ্গা মুসলিমের মৃত্যু ঘটে।[২০] মিয়ানমার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত জাপানী বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ইয়েজো ইকোতা মিয়ানমার সফর শেষে কারাগারের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, মিয়ানমারে মোট আটাশটি কারাগারের মধ্যে *ইনসেন* কারাগারটিই শুধুমাত্র তাকে দেখতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার বিবরণ মতে, তাতে কয়েদীদের কোন সুযোগ সুবিধাতো নেইই; বরং কয়েদীদের সংখ্যা কারাগারের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ৪ গুণ বেশী। আর এটাই ছিল তাকে দেখানোর মত সুব্যবস্থা সম্পন্ন কারাগার।[২১] এতেই অনুমান করা যায়, অন্যান্য কারাগারগুলোর পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা একদিকে পাশবিক নির্যাতনের তাণ্ডব চালিয়ে রোহিঙ্গাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে অন্যদিকে পথিমধ্যে দেশত্যাগী রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমণ করে সর্বস্ব লুট, গ্রেফতার ও হত্যার পথ বেছে নেয়। জান্তার ভয়ে পাহাড়ী দুর্গম পথ মাড়িয়ে, জেলে নৌকায় নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় তারা রোহিঙ্গাদের উপর বিভিন্ন কায়দায় আক্রমণ চালায়।[২২] এছাড়া গ্রেফতার, নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের কারণে যে সকল রোহিঙ্গা পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়ে সহায়-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর জন্য বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নেয় বর্মীবাহিনী তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। এমনকি তারা শিশুদেরকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের সামনেই নির্মমভাবে হত্যা করে।[২৩]

নারী নির্যাতনঃ

মান-সম্মান, ইয্যত-সম্ভ্রম ও জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে স্বদেশে বসবাস করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক মানবিক অধিকার হ'লেও রোহিঙ্গারা এসব বিষয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে না। বর্মীসেনা এবং মগরা রাতের অন্ধকারে আরাকানের বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করে ঘরের দরজা ভেঙ্গে রোহিঙ্গা-যুবতী ও গৃহবধুদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনেই পৈশাচিক কায়দায় ধর্ষণ করে। কাউকে অপহরণ করে গভীর জঙ্গলে কিংবা সেনাক্যাম্পে নিয়ে গণধর্ষণ চালিয়ে হত্যা করে। আত্মীয়-স্বজনদের কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকেও হত্যা করা হয় কিংবা তার উপরও অমানবিক নির্যাতন চালান হয়।[২৪]

মুসলিম জাতিসত্তা বিনষ্ট করে মগ প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মগ সেনারা মুসলিম নারীগর্ভে মগসন্তান ধারণ ও লালন করার জন্য ধর্ষিতা মহিলাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃকল্যাণ সদনে বন্দী করে রাখে। অপরদিকে গর্ভবতী মুসলিম

১৮. *দৈনিক জনতা*, ২৯ সেপ্টেঃ ১৯৯১।
১৯. *দৈনিক মিল্লাত*, ১২ জানুঃ ১৯৯২ ও *ঘবা ঝাংধরাং এুরসবং*, ১১ ঘড়া. ১৯৯২.
২০. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০,২১ জানুঃ ১৯৯২।
২১. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ মার্চ ১৯৯২।

২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ১৯৯২।
২৩. *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই ১৯৯২।
২৪. ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্মী সেনাক্যাম্প থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আগত রহীমা (২৫) ফাতেমা (২৪) ও হাজেরা (২২) জানায়, বর্মীসেনাদের পৈশাচিক বর্বরতার শিকার হয়ে অনেক রোহিঙ্গা যুবতী সেনা ক্যাম্পে প্রাণ হারিয়েছে। রহীমা জানায়, মগসেনারা তিন কন্যা ও স্বামীর সামনে তাকে ধর্ষণ করে চলে যাবার সময় তার স্বামীকে গুলী করে। বর্মীসেনারা ফাতেমা (দুই কন্যার জননী) এবং হাজেরা (এক সন্তানের জননী) ঘর থেকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ৮/১০ জন উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। দু'জনের স্বামী তাদের আনার জন্য ক্যাম্পে গেলে তাদেরকেও গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিছুদিনপর হাজেরার স্বামী পালাতে পারলেও ফাতেমার স্বামীর খবর নেই। তারা আরো জানায়, ক্যাম্পে শতাধিক নারী দেখেছে; তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম চলছে এবং অনুরূপভাবে মগসৈন্যরা ইমামুদ্দীনপাড়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে তার সামনেই স্ত্রী জোহরা বেগম ও তার ১২ বছরের শিশুকন্যাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে এবং ঘরের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। দ্রঃ *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২৮ ডিসেঃ ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ২৮ জানুঃ ১৯৯২; *DAWN*, Pakistan, March 17, 1992.

রমণীদের গর্ভ নষ্ট করে দেবার জন্য মগ সেনারা ভ্রাম্যমাণ এম. আর. এবং ডি.এন.সি. প্রকল্প চালু করে।[২৫]

আরাকানের রাচিদং থানার রাজার বিলপাড়া গ্রামের অধিবাসী গুলবানু (৮০) তাঁর দুই মেয়ে ফাতেমা ও মদীনা, জামাতা কেফায়েতুল্লাহ ও আবদুশ্ শুকুর এবং ৪ জন নাতি-নাতনী নিয়ে একই বাড়ীতে বসবাস করতেন। ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনে বর্মী সেনারা তাঁর স্বামীকে হত্যা করে এবং জমি-জমা বাজেয়াপ্তকরণসহ অনেক জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তবুও নিজের ১০ কানি[২৬] জমিতে চাষবাস করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু মগ সেনারা ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে জবরদস্তী শ্রমের জন্য তার দুই জামাতাকে ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের শেষ প্রান্তে জনৈক পরিচিতজনের কিশোরী কন্যাকে মগ সেনারা ধরে নিয়ে গেলে সে ঘটনা দেখার জন্য গুলবানু সেখানে যান। এদিকে মগ সেনারা তার বাড়ীতে এসে কন্যা ফাতেমা ও মদীনাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি ফিরে এসে দেখলেন ফাতেমার আট বছর, তিন বছর ও ছয় মাসের শিশু কন্যা যথাক্রমে নূরে সাফা, আমেনা এবং হানীফাসহ মদীনার দুই বছরের আবদুল মজীদ উঠোনে কান্নারত। প্রতিবেশীরা জানায়, মগ সেনারা ফাতেমা ও মদীনাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের আর্তচিৎকার ও বাঁচার করুণ আকুতি সত্ত্বেও কেউ বন্দুকের সামনে আসতে সাহস পায়নি। তারা দু'বোনকে ক্যাম্পে নিয়ে একটানা চার দিন উপর্যুপরি পাশবিক নির্যাতন চালায়। খাবার হিসাবে শুধু বিস্কুট এবং পানি দিয়েছে। চারদিন পর কোন এক সুযোগে তারা সেনা ছাউনি থেকে পালিয়ে আসে। এক সপ্তাহ পরে দু'জামাতা আধমরা জীবন নিয়ে ফিরে এলেও তাদের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং খাদ্যাভাব ও শারীরিক নির্যাতনের ফলে চালিকাশক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ী ফিরে স্ত্রীদের ইয্যতহানির ঘটনা শুনে অশ্রু ফেলা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। দু'একদিনের মধ্যে স্বদেশ ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেও ঐদিন সন্ধ্যা রাতে চারজন মগ সেনা আবারও দরজা ভেঙ্গে দু'মেয়েকে ঘর থেকে টেনে বের করে উঠোনে নিয়ে আসে। আহত জামাতা দু'জন কোন প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। কিন্তু আশি বছরের বৃদ্ধা মা গুলবানু সহ্য করতে না পেরে ধারালো টাকফাল (দা) হাতে তুলে নেন এবং কোন পরিণতি চিন্তা না করে একজন সৈনিকের গলায় কোপ বসিয়ে দেন। সে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে এবং অন্য তিনজন ভয়ে তার সাথীকে ফেলে পালিয়ে যায়। উঠোনে পড়ে থাকা রক্ত মাটি চাপা দিয়ে লাশটি নদীতে ভাসিয়ে সে রাতেই তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।[২৭] নিঃসন্দেহে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের এটি একটি ভয়াল চিত্র। মগ সেনারা রোহিঙ্গাদের উপর কতটা নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে এ ঘটনাই তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে একজন বৃদ্ধা মাতাও যে হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী, যুদ্ধংদেহী এটিই তার জলন্ত প্রমাণ। এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাংবাদিক পাঠকের নিকট প্রশ্ন রাখেন, 'গুলবানু কি খুনি না বীর মাতা'? বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে বীর মাতা বলাই যুক্তিযুক্ত।

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধনঃ

আন্তর্জাতিক আইনে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার থাকলেও আরাকানের মগ জনগোষ্ঠীর নিকট রোহিঙ্গাদের ধর্মীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে যিম্মী। মসজিদে ছালাত আদায়, মহিলাদের পর্দা পালন, ঈদের ছালাত আদায়, এমনকি ইসলামী শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম মক্তবে কুরআন-হাদীছ চর্চার পথও বন্ধ করে দেয়। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে মংডুর শিকদারপাড়া মসজিদে ঈদের ছালাত আদায়ের সময় মগ সেনারা ব্রাশ ফায়ার করে ৪ শতাধিক মুছল্লীকে হত্যা ও সহস্রাধিককে আহত করে।[২৮] শুধু সাধারণ মুছল্লীই নয়, আলেম সমাজও রেহাই পায়নি মগ ও বর্মী সেনাদের নির্যাতনের হাত থেকে। স্থানীয় বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টির লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের একটি মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদের ইমাম তাদের বাধা প্রদান করে। ফলে তারা তাকে মারপিট করে বন্দুকের নলের মুখে রেখে মসজিদের অভ্যন্তরেই মাথা ন্যাড়া করে দেয়।[২৯]

আরাকানে রোহিঙ্গা দলন-পীড়ন, নিধন ও বিতাড়নের পাশাপাশি মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী প্রতিষ্ঠানাদি এবং ঐতিহ্যের নামনিশানা মুছে ফেলার জন্য তারা আরাকান অঞ্চলের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করেছে; বিশেষতঃ উচ্ছেদকৃত মুসলিম জনবসতি এলাকার মসজিদসমূহকে ধ্বংস করে সেনাক্যাম্প নির্মাণ এবং গোয়ালে রূপান্তরিত করেছে। মসজিদ পাঠাগারে রক্ষিত পবিত্র কুরআন, হাদীছ ও হাযার হাযার ইসলামী বইপত্র রাস্তায় ফেলে কিংবা পুড়িয়ে

২৫. তদেব।
২৬. উল্লেখ্য, ১ কানি = ১ বিঘা ২০ শতাংশ জমি।

২৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুঃ ১৯৯২। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারী সাংবাদিক কাজী রওনাক হোসেন ও তোফায়েল আহমদ ধেচুয়া পালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা শরণার্থী গুলবানু ও তার দু'মেয়ের সাথে কথা বলে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। সংবাদের শুরুতেই গুলবানুর আঞ্চলিক ভাষায় সাহসিকতার কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়, 'আর চোগর সামনতদ্দি আঁর দুই মাইয়ারে ক্যাম্পত দরি নিব-জুলুম গরিবাল্লাই। হেতল্লাই দিলুম টাকফাল দি এক কোঁপ...।'
২৮ *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই ১৯৯২।
২৯ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ মে ১৯৯১।

বিনষ্ট করে।[৩০] সেখানে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রেডিও, টিভি এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়াও কুরআন-হাদীছের পৃষ্ঠা সিগারেটের ফিল্টার তৈরীতে ব্যবহার করে।[৩১] তারা রোহিঙ্গাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্যের উপর চরম ধ্বংসযজ্ঞ চালায়;[৩২] এমনকি শত শত বছরের লালিত বাংলা ভাষা, দাপ্তরিক ভাষা ফার্সীর নাম-নিশানা পর্যন্তও মুছে ফেলা হয়।[৩৩] তারা ১৯৮২ সালে 'বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনে' আরাকানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেবার পর মিয়ানমারের পাঠ্যপুস্তক ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী থেকে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস বাদ দিয়ে পুরো প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালায়।[৩৪]

নির্বাচিত রোহিঙ্গা জনপ্রতিনিধিদের অবস্থাঃ

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানতো দূরের কথা, আরাকানের নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যান-মেম্বারগণই মগ সেনাদের হাতে পাশবিক নির্যাতনের শিকার। তাদেরকে বর্মী সেনাদের আদেশে মোটা অংকের চাঁদা প্রদান, সেনাক্যাম্পে রোহিঙ্গা নারী সরবরাহ ও নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য প্রদান এবং বাধ্যতামূলক শ্রমে (বিনা পারিশ্রমিকে) লোক সরবরাহ করতে হয়। এমনকি তাদের নিজ পরিবারের সুন্দরী যুবতী মহিলারাও মগ সেনাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। এ কাজে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হবার কারণে মংডু এলাকার কুর্মা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দুল আমীনকে চেয়ারম্যান পদ থেকে বরখাস্ত করে এবং ৫ জন যুবতী সরবরাহে ব্যর্থ হবার কারণে বলিবাযার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাব্বির আহমাদকে বেদম মারধর করে। অপর একজন চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইয়াকুবকে তিন পুত্রসহ এবং সিকান্দার আলী নামক এক মেম্বারের ৪ পুত্রসহ সবাইকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।[৩৫] বর্মী সেনাদের চাহিদা মাফিক কুলি ও রোহিঙ্গা যুবতী সরবরাহে ব্যর্থ হবার কারণে তারা বলীবাযার থানার তুলাতুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নবী হোসেন (৪৫) কে প্রকাশ্য দিবালোকে আম গাছের সাথে পেরেক মেরে বেঁধে রেখে তার নাক ও কান কেটে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।[৩৬] একই অপরাধে মুহাম্মদ কাছিম উদ্দীন চেয়ারম্যানকে সস্ত্রীক ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রী ফাতেমাকে (৩৫) ২ দিন আটক রেখে সেনা অফিসাররা পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ফাতেমা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও কাছিম চেয়ারম্যানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৩৭] আরাকানের মংডু টাউনশীপের আওতাধীন রিয়াজুদ্দীনপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নূরুল আলমের ঐতিহ্যবাহী বিশাল বাড়ীতে ৮০ জন মগ সেনার সমন্বয়ে সেনাক্যাম্প বসানো হয় এবং তাদের জন্য তাকে প্রতিদিন এক মণ চাল, ৬০টি মুরগী অথবা ২টি খাসী ও প্রয়োজনীয় তেলসহ রান্না সামগ্রী সরবরাহ করতে হ'ত। তারপরেও অকৃতজ্ঞ মগ সেনারা তার ১২ বছরের শ্যালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণপূর্বক হত্যা করে। তিনি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেনের নিকট এ ঘটনার বিচার প্রার্থী হ'লে ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হয় যে,'তার স্ত্রীর পরিণতিও এমন হবে'। অতঃপর বৃদ্ধা মা ও সাত ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি মিলে যৌথ পরিবারের ৩২ জন সদস্য নিয়ে ১৯৯২ সালের ২৫ জানুয়ারী রাতের আঁধারে স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি ফেলে তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন।[৩৮] এছাড়া ১৯৮৮ সালের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের পর হ'তে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যানদের বাদ দিয়ে মগদেরকে অবৈধভাব চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।[৩৯] নির্যাতনের খবর যাতে বিশ্ববিবেক জানতে না পারে সেজন্য সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের পালানোর পথে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বসিয়ে বর্ডার সীল করে দেয়। এমনকি তারা বাংলাদেশের সীমান্ত শহর টেকনাফ দিয়ে বার্মার ৮ ঘণ্টার জন্য আসা যাওয়ার ট্রানজিট পাসও বন্ধ করে দেয়।[৪০] জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল *জ্যাঁ এলিয়াসনসহ* আরাকান সফরকারী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা সরেজমিনে রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখার জন্য এলেও বর্মী সামরিক জান্তার ছলচাতুরীর কারণে তারা সঠিকভাবে অবস্থা পরিদর্শন করতে ব্যর্থ হন। তিনি মিয়ানমার সফরকালে আকিয়াব, মংডু ও বুচিদং এলাকাসমূহে রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলতে চাইলে আগে থেকেই রোহিঙ্গাদের পোষাক-পরিচ্ছদে ঠিক করে রাখা মগদের এনে হাজির করা হয়েছিল।[৪১] অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি সরাসরি গ্রামে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁকে সুকৌশলে ফিরিয়ে আনা হয়।

---

৩০ *New Straits Times*, 9 April, 1992; উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন চলাকালেও ১৯৯৭ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরাকান প্রদেশে ২৫টি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মোহংয়ের ৬'শ বছরের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ চান্দিখান মসজিদটিও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। দ্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৭।

৩১ *মাসিক দাওয়াত*, এপ্রিল- মে ৯৯ সংখ্যা, চট্টগ্রাম, পৃ. ১২-১৩।

৩২ তদেব।

৩৩ তদেব।

৩৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

৩৫ *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জুন ১৯৯১।

৩৬ *দৈনিক বাংলা*, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

৩৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১।

৩৮ *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুঃ ১৯৯২।

৩৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ ডিসেঃ ১৯৯১।

৪০ *দৈনিক মিল্লাত*, ২২ আগষ্ট ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম* ৯ এপ্রিল, ১৯৯২ ও *ঞযব উধরষু ঝঃধৎ*, ৩১ গধৎপয, ১৯৯২.

৪১ *দৈনিক সংগ্রাম* ৯ এপ্রিল ১৯৯২।

জনমত জরিপ ঃ নির্যাতন ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ

দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকাসহ আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন মহল থেকে মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের খবর প্রচারিত হয়। কিন্তু মিয়ানমার প্রশাসন এ নির্যাতনের খবরকে ভিত্তিহীন বলে প্রচার করে।[৪২] তাই এ বিষয়ে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়, মিয়ানমারের সামরিক সরকার বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন করছে বলে পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে। এ সকল অভিযোগের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

সারণী-১

জনমত ঃ রোহিঙ্গা নির্যাতন প্রসঙ্গ[৪৩]

উত্তরদাতা	সংখ্যা	আংশিক সত্য	%	সত্য	%	সত্য নয়	%
১.শিক্ষাবিদ	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
২. সাংবাদিক	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
৩. কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
৪. পেশাজীবী	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
৫. এনজিও কর্মকর্তা	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
৬. ওলামা	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
৭. আমলা	৫ জন	১	২.৫	৪	১০	-	০০
৮. রাজনীতিবিদ	৫ জন	-	০০	৫	১২.৫	-	০০
সর্বমোট	৪০ জন	১	২.৫	৩৯	৯৭.৫	--	০০

সারণীতে উল্লিখিত ৮ শ্রেণীর সচেতন জনগোষ্ঠীর ৪০ জনের মান সর্বমোট ১০০ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রত্যেকের মান হয় ২.৫ এবং প্রতি ৫ জনের মান ১২.৫ হবে। উল্লিখিত ৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৯ জনই মিয়ানামারের সামরিক সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের সংবাদকে সত্য বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন; যা সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ। আর একজন মাত্র উত্তরদাতা একে আংশিক সত্য বলে উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে ৩৯ জন উত্তরদাতার অধিকাংশই মন্তব্য করেন যে, মিয়ানমারে সামরিক সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের যে খবর প্রচার হয় এটা খণ্ডচিত্র মাত্র; পুরো চিত্র নয়। মিয়ানমার সামরিক শাসন বা অবরুদ্ধ দেশ হবার কারণে সেখানে কোন সাংবাদিক মিশন বা প্রচার মাধ্যমের সদস্য নির্বিঘ্নে মাঠ পর্যায়ে বিচরণ করে নির্যাতনের পুরো চিত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। নির্যাতনের যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে, মূলতঃ সেখানকার অবস্থা তার চেয়ে আরো বহু গুণ বেশী ভয়াবহ।

৪২ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৮ অক্টোবর ১৯৯১।

৪৩ জনমত জরিপের তথ্যটি আমার প্রণীত "রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪" শীর্ষক এম.ফিল. থিসিস, ২০০০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, থেকে সংগৃহীত, পৃ. ২০৭।

জনমত জরিপ ঃ মানবাধিকার প্রসঙ্গ

ন্যায়বিচারকে পদদলিত করা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার মৌলিক মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।[৪৪] কিন্তু মিয়ানমার সরকার ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাকে উপেক্ষা করে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারের চরম লংঘন করে চলছে। মানবাধিকারের সর্বাজনীন ঘোষণার ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ লংঘন হয় সেগুলোর জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশীমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্যাতন করা যাবে না।'[৪৫] অনুরূপভাবে মতামত প্রকাশ, সংঘবদ্ধ হওয়া, সরকারী অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমের নায্য মজুরী পাওয়া, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের প্রাপ্তিসহ নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ রয়েছে।[৪৬] কিন্তু মিয়ানমারের সামরিক সরকার জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনের এ সকল সনদের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল-খুশীমত রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানবাধিকারের চরম লংঘন করে চলেছে। এ সম্পর্কে *Amnesty International* রিপোর্টের মন্তব্য "United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) now has a field presence both in Bangladesh and in Rakhine State where they monitor human rights violations against Rohingyas."[৪৭] *মাসিক দাওয়াত* পত্রিকা Amnesty International এর আরো একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছে "The Rohingyas are a Muslim minority from the Arakan state in Myanmar. They are apparently fleeing because of human rights violations committed by Myanmar armed forces that have intensified the level of their operation in Arakan state."[৪৮]

রোহিঙ্গারা তাদের বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে বার বার শরণার্থী হিসাবে বাংলাদেশে আসার ফলে তারা ক্রমশঃ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসহ মানবাধিকারের চরম লংঘনের এ ঘটনায় মানবাধিকার সংস্থাসমূহের মন্তব্যের পাশাপশি বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন সে লক্ষেই একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ

৪৪ Faiues Ezejiofor, *Protection of human right under the Law* (London : Butter worths, 1964), p. 3.

৪৫ *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র*, ঢাকা ঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৮, পৃ, ৭-৮।

৪৬ *মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র*, ১৯,২০,২১,২২,২৫ ও ২৭ ধারা দেখুন।

৪৭ ÒEthnicity and Nationality : Refugees in Asia,Ó *Amnesty International*, October, 1997, London, p. 15.

৪৮ *মাসিক দাওয়াত*, পৃ. ১৩ ।

চালানো হয়। প্রশ্নে উল্লেখ করা হয় যে, জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার সনদ' অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে। রোহিঙ্গারা বিতাড়িত হবার ফলে তাদের এ অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি?

সারণী-২

মানবাধিকার প্রসঙ্গ[৪৯]

উত্তরদাতা	সংখ্যা	হ্যাঁ	%	না	%	মন্তব্য ক	%
১. শিক্ষাবিদ	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
২. সাংবাদিক	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
৩. কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট	৫ জন	৪	১০	-	০০	১	২.৫
৪. পেশাজীবী	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
৫. এনজিও কর্মকর্তা	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
৬. ওলামা	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
৭. আমলা	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
৮. রাজনীতিবিদ	৫ জন	৫	১২.৫	-	০০	-	০০
সর্বমোট	৪০ জন	৩৯	৯৭.৫	--	০০	১	২.৫

সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হবার ফলে তাদের মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে বলে ৩৯ জন উত্তরদাতাই হ্যাঁ বলেছেন; যা সচেতন জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ। আর একজন উত্তরদাতা যিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী-এ প্রশ্নে কোন মন্তব্য করেননি। রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের কলামে তিনি যা উল্লেখ করেন তা হল-"আরাকান তথা মিয়নামারে তো গৃহযুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে না। তাই রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হিসাবে বাংলাদেশে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। যারা আসছে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে মিয়ানমার সরকারের তথাকথিত নির্যাতনকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার মত কোন বিষয় দেখছি না'।

এই একজন মাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছাড়া উত্তরদাতাদের সকলেই দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছেন, মিয়ানমার সরকার যা করছে তা অবশ্যই মানবাধিকারের চরম লংঘন। পেশাজীবীদের মধ্যকার একজন মন্তব্য করেন, মিয়ানমার সরকারের সকল কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র '১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে'র মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সাথে যে আচরণ করেছে এটুকু পর্যালোচনা করা যায় তাহ'লেই মানবাধিকার লংঘনের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। মূলতঃ রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকার যা করছে এটা অত্যন্ত অমানবিক। শিক্ষাবিদগণের একজন বললেন, 'বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের শ্লোগান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের উপর অবিচার ও নির্যাতন ততই বেড়ে চলছে। বর্তমানে 'মানবাধিকার' শব্দেরই মানবাধিকার বিপন্ন। ফলে বাড়ির কাছের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে কথা বলা বা চিন্তা করার সময় ও সুযোগ কারো হাতে নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে যতটা ভাবা হয়, তার চেয়ে আরাকানের মুসলিম নিধন তথা রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার হরণের ঘটনা নিয়ে কম চিন্তা করা হয়। ফলে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম মানবেতর জীবন যাপন করে সভ্য জগতের প্রায় অলক্ষ্যে নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাচ্ছে'।

উপসংহারঃ

প্রীথয়া শব্দের অর্থ হলো শান্তির দেশ বা সুন্দর দেশ। ১৯৯১-৯২ সালে মিয়ানমার সরকার পিয়েথায়া বা মগ ভাষায় প্রীথয়া অভিযানের মাধ্যমে আরাকানে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।[৫০] এ পিয়েথায়া অপারেশনের নামে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ৩ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল।[৫১] বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিলেও অদ্যাবধি বিশ হাযারেরও অধিক শরণার্থী বাংলাদেশে রয়ে গেছে। এ অভিযানে মিয়ানমার সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের তথাকথিত নাগরিকত্ব ইস্যু এবং সীমান্ত চোরাচালানীর জন্য দায়ী করে। অথচ চোরাচালানীর কাজে জড়িতদের শীর্ষভাগই মগ।[৫২] রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন অমুসলিম অধ্যাপক বলেন, 'রোহিঙ্গারা যদি মুসলমান না হ'ত তবে সমস্যা এত প্রকট হ'ত না; মানবাধিকার লংঘনের মত এত বড় বড় ঘটনাও ঘটত না। মূলতঃ এটা মিয়ানমার সরকারের সংকীর্ণ মানসিকতারই ফলশ্রুতি।" সুতরাং বাংলাদেশের সরকারী দলীল-দস্তাবেজ, প্রচার মাধ্যম এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সত্যিকার অর্থে মিয়ানমার সরকারের এ রোহিঙ্গানীতি মানবাধিকারের প্রত্যক্ষ ও চরম লংঘন এবং ঠাণ্ডা মাথায় তথাকার মুসলিম জাতিসত্বা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত।

---

৪৯ রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪" শীর্ষক এম.ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ২১৩।

৫০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৫১ কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাধীন রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও নাইক্ষংছড়ি থানায় মোট ২৩টি ক্যাম্পে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাযার আটশত সাতাত্তর জন শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল এবং আশ্রয় শিবিরের বাইরেও ৩৯,২৮৭ জন শরণার্থী এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়তার পরিচয়ে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে। দ্রঃ Refugees Relief and Repatriation Commissioner, CoxBazar; Philip Gain (ed.), *SHESHU REPORT, 1, Rohingya Refugee Issue* (Dhaka : SHESHU- An Alternative Media Approach, 1992), p. 31.

৫২ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসের পাঁয়তারা

*নূরুল ইসলাম**

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড- Education is the backbone of a nation. সুশিক্ষা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে মহীয়ান করে তোলে। অজ্ঞানতার অন্ধকার প্রদোষের বুক চিরে মানুষের জীবনে যখন জ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সে সোনার মানুষে পরিণত হয়। প্রখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন, 'সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সবকিছু ভাস্বর হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে'। শিক্ষাবিহীন মানুষ রূহ বা আত্মাহীন অসাড় দেহ। রূহবিহীন নিথর-নিস্তব্ধ দেহকে যেমন মানুষ বলা যায় না, তেমনি শিক্ষাবিহীন জীবনকে স্বার্থক জীবন বলা যায় না। জীবনকে স্বার্থক-সুন্দর করে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক রুশো বলেছেন, 'আমাদের জন্মকালীন ত্রুটি সংশোধন, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভে আমাদের যা প্রয়োজন, সেসবই পূরণ করে শিক্ষা'। সিসরো মন্তব্য করেছেন, 'যতই উর্বরা হোক, একটা জমি যেমন কর্ষণ ছাড়া ফসল দিতে পারে না, শিক্ষা ছাড়া মানুষের অবস্থাও তেমনি'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিক্ষা ও জীবন আলাদা করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। শিক্ষা সবসময়ই মহামূল্যবান রত্ন। সক্রেটিস বলেছেন, 'লোহা কেবলমাত্র যুদ্ধের ময়দানেই সোনা অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু জ্ঞান সব সময়ই সোনার চেয়ে মূল্যবান'।

॥ দুই ॥

একটি শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় প্রথমতঃ তার পরিবারেই। তাই পরিবারকে সমাজতাত্ত্বিকরা 'শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, Give me a good mother. I will give you a good nation. 'আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাদের একটি আর্দশ জাতি উপহার দেব'। মায়ের আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয় শিশুর উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী লেস্টার ডি. ক্রো এবং এলাইস ক্রো বলেছেন, "The mother's attitude during baby-hood years can have relatively serious effects on the child's developing behaviour.[১]

মা-বাবার পরে যে প্রতিষ্ঠানটি একজন শিশুর মানসিক বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করে তা হচ্ছে বিদ্যালয়। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক Langdon E. Longstreth বলেছেন, "Next to parents, the school undoubtedly constitutes the most influential determinant of psychological development."[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'প্রত্যেক শিশু ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতির (ইসলামের) উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার বাবা-মাই তাকে পরিণত করে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা মূর্তিপূজকে'।[৩] আলোচ্য হাদীছ সম্পর্কে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আসাদ তাঁর বহুল পঠিত Islam at the Cross-Roads গ্রন্থে বলেছেন, 'উক্ত হাদীছে ব্যবহৃত 'বাবা-মা' ন্যায়শাস্ত্রমতে সম্প্রসারিত হয়ে পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়, সমাজ প্রভৃতি সাধারণ পারিপার্শ্বিকতাকে বুঝাতে পারে, যার ভিতরে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয়'।[৪]

আমাদের দেশে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য চারটি স্তর হচ্ছে- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। এ স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার পাদপীঠ। প্রাথমিক শিক্ষাকে দেহের কলব বা হার্টের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হাদীছে এসেছে, 'শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। যদি তা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে তাহ'লে গোটা শরীর সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে। আর যদি তা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহ'লে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐ গোশতপিণ্ডটি হচ্ছে কলব বা হৃদয়'।[৫] অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার হার্ট। সেখানে বিপর্যয় ঘটলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে শিশুদের মন শৈশবে কাদামাটির মত নরম-কোমল থাকে। তাদের সেই কাদামাটিরূপ সহজ-সরল মনের আঙ্গিনায় যে চারা রোপণ করা যায়, তা কিশলয় থেকে পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে মহীরুহের আকার ধারণ করে। তাদেরকে এ সময় যে শিক্ষা দেয়া হয় সেটি তাদের মনের গহীন রাজ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। আরবী প্রবাদে আছে, 'আল-ইলমু ফিছ-ছিগারি কান-নাকশি ফিল-হাজারি'। অর্থাৎ শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করা চিত্রাঙ্কনের মতো। কোন মনীষী বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করা চিত্রাঙ্কনের মতো স্থায়ী হয়ে থাকে। আর বার্ধক্যের শিক্ষা পানির উপর অঙ্কনের মতো অস্থায়ী'।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উপর এ কারণেই সূদখোর মহাজন ব্র্যাকের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে। ইতিমধ্যেই তারা দেশবাসীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে সূদের

*এম. এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *Lester D. Crow and Alice Crow, Child Development and Adjustment (New York: The Macmillan Company, 1967), p.463.*

২. *Langdon E. Longstreth, Psychological Development of the Child (New York: The Ronald Press Company, 1968), p. 439.*

৩. *বুখারী হা/১৩৮৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

৪. *মুহাম্মাদ আসাদ, সংঘাতের মুখে ইসলাম, মূলঃ Islam at the Cross-Roads সৈয়দ আব্দুল মান্নান অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃঃ ৪৯।*

৫. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/২৭৬২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*

জালে আটকে ফেলেছে জাতিকে। আসলে তারা দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে দারিদ্র্যের লালন ও কর্ষণ করতেই বেশী আগ্রহী। গৃহস্থের হালের বলদ, ঘরের টিন, মহিলাদের কানের দুল, নাকফুল ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা তো পত্র-পত্রিকায় হরহামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে। এবার শুরু হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। গত ১৩ মার্চ সরকার দেশের ৩০টি উপযেলার ৩ হাযার ১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিটরিং, সুপারভিশন ও প্রশিক্ষণের ক্ষমতা ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের 'ব্র্যাক প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' মতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স কোর্স, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অভিভাবক এবং এসএমসি বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয়করণ, স্কুল ও ইউনিয়ন ফোরাম গঠন, শিক্ষকদের পাক্ষিক সভার আয়োজন, প্রশিক্ষক নিয়োগ, যেলা-উপযেলা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, মনিটরিং এবং রিপোর্ট করার দায়িত্ব পালন করবে ব্র্যাক। এভাবে ব্র্যাকের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার তুলে দিয়ে তিলে তিলে জাতির শিক্ষার মৌলিক স্তরকে ধ্বংসের নগ্ন পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লিখেছেন, 'ব্র্যাক তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে NCTB-এর বই ব্যবহার করে না, তারা ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব ব্র্যাকের বই। যার অর্থ বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় যে প্রক্রিয়ায় লেখাপড়া করানো হয় ব্র্যাকের সে ব্যাপারে সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা নেই। অনানুষ্ঠানিক স্কুলে পাঁচ বছরের কার্যক্রম শেষ করা হয় চার বছরে-ছাত্রছাত্রী মূলধারার শিশুরা নয়। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠ্যবইগুলো ভিন্ন। যদি দেশের মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের সত্যিকার অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহ'লে ২০টি উপজেলার (শিক্ষকদের ভাষ্য মতে ৩০টি উপজেলা) কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তারা কোন সাহসে নিতে চাইছে'।[৬]

আসলে তাদের এ দায়িত্ব নেয়ার পিছনে কাজ করছে সুদূরপ্রসারী অভিসন্ধি। তারা এ দায়িত্ব নিয়ে কচিমনের শিশুদের মগজ ধোলাই করে শিক্ষার ফাউন্ডেশনকে ধ্বংস করে জাতিকে অন্ধকারের চোরাগলিতে নিক্ষিপ্ত করতে চায়। ধর্মহীন সেক্যুলার করে গড়ে তুলতে চায় আমাদের শিশুদের।

আমাদের শিশুদের ধর্মহীন আদর্শে গড়ে তোলার জন্যই তারা ছলে-বলে-কৌশলে প্রাথমিক শিক্ষা কব্জাকরণের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের বলিষ্ঠ নাগরিক। জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার তো তারাই। সুতরাং যেকোন মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার নাটাই তাদের চাই-ই। ১৯৩৬ সালে লর্ড ম্যাকলে বলেছিলেন,

"We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour; but English in taste, in openion, in moral and intellect."

'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'। বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোন বলেছিলেন, "So long as the Muslims have the Quran, We shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it". 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা কুরআনকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দমানো বা পরাভূত করা সম্ভব হবে না। তাই হয় তাদের থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে, না হয় তাদের হৃদয় থেকে মুছে দিতে হবে কুরআনের প্রেম ও ভালবাসা'।

॥ তিন ॥

আমরা বর্তনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেখেছি, মহানবী (ছাঃ)-কে কটাক্ষ করে কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছে, জন্ম নিবন্ধন ফরম, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ধর্মীয় পরিচয় রাখা হয়নি। এ সরকার কুরআন মাজীদে বর্ণিত ইসলামের শাশ্বত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দুঃসাহসও দেখিয়েছে এনজিওগুলোর প্ররোচনায়। এভাবে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সবক্ষেত্রেই এনজিওগুলো অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। গত ১২ জুলাই '০৮ একটি জাতীয় দৈনিকের প্রধান শিরোনাম ছিল 'বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এনজিওগুলো'। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকায় এনজিওগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মূলতঃ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই সেক্টরের কুশীলবরা হয়ে পড়েছেন বেপরোয়া। মানব সেবার বদলে তারা ব্যবসা প্রসারের পাশাপাশি দেশের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। টিআইবির এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রতিবছর এনজিও সেক্টরে দুই হাযার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়। অথচ ১/১১ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ঢেউ সব সেক্টরে লাগলেও এনজিও সেক্টরকে স্পর্শ করেনি। রিপোর্টের শেষের দিকে বলা হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলে সিডর আঘাত হানার পর সরকার এই এলাকায় এনজিওগুলোর ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সরকারের সে নির্দেশ অমান্য করে এনজিওগুলো দুর্গতদের কাছ থেকে জোর করে কিস্তি আদায় করে। এনজিওর চাপে বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহীতারা ত্রাণের চাল বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।[৭]

৬. *প্রথম আলো, ২৪ জুন '০৮, পৃঃ ১০।*

৭. *ইনকিলাব, ১২ জুলাই '০৮, পৃঃ ১, ১১।*

গত ২৮ জুন টিআইবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক কনভেনশনে বলেছেন, সামাজিক উন্নয়নে এনজিওগুলো কতটা কাজ করছে তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনজিওকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণের নামে অনেক এনজিও টাকা নিয়ে ভেগে যাচ্ছে। বড় বড় কর্পোরেট এনজিওগুলো আরো অনেক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তারা ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার পর ঐ টাকা দিয়ে নিজেদের মুরগি কেনাচ্ছে, মুরগির খাবার কেনাচ্ছে। এভাবে তারা দ্বিগুণ লাভ করছে।

এদিকে ব্র্যাকের মালিকানাধীন 'ব্র্যাক ব্যাংক'-এর স্বার্থরক্ষায় ব্যাংকিং আইন শিথিলের প্রক্রিয়া চলছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, ব্র্যাক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ বেসরকারী খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানির ৫১ শতাংশ শেয়ার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালনা পরিষদও তাদের শেয়ার ব্র্যাক ব্যাংকের কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ব্যাংক কোম্পানির আইন। এ আইন অনুযায়ী কোন ব্যাংকের অন্য কোন কোম্পানির মালিকানা কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই ব্র্যাক ব্যাংক জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ার যাতে কিনতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের সুপারিশ করেছে। সচেতন দেশবাসীকে এ ঘটনা রীতিমত বিস্মিত করেছে।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়েও এনজিওগুলো ছিনিমিনি খেলছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় দেড় শতাধিক এনজিও কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাস, ইমডো আশিকা, প্রশিকা, ব্র্যাক, এডাব, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, গ্রীণহিল, ইকো ডেভেলপমেন্ট, সিআইপিডি প্রভৃতি। ২৫ জুলাইয়ের একটি জাতীয় দৈনিকের 'পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওগুলোর মিশন-ভিশন নিয়ে নানা প্রশ্ন' শিরোনামের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অর্থে পরিচালিত মানব সেবার নামে গড়ে ওঠা এনজিওগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাদের মিশন-ভিশন কি তাও জানা নেই কারো। রিপোর্টে আরো বলা হয়, এনজিও এবং দাতা সংস্থার ছদ্মাবরণে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে বিদেশী নাগরিকদের গোপন সফর, সার্বভৌমত্ব বিরোধী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, দুর্নীতি-অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ লোপাট।[৮]

৮. *ঐ, ২৫ জুলাই '০৮, পৃঃ ১২, ৮।*

॥ চার ॥

১৮৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী গোটা ভারতবর্ষে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাযার। ১৯৪১ সালে গোটা অবিভক্ত বাংলায় মোট দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাযার ৪২৬ জন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের ভাগে এসেছে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ হাযারেরও কম। ১৯৬১ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০টি সংস্থা খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। ১৯৪১ সালে যেখানে বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৫ বা ২০ হাযার, সেখানে ১৯৬১ সালে হয় ৮০ হাযার এবং ১৯৭০ সালে হয় ১ লাখ ২০ হাযার। অপরদিকে ১৯৪১ সালে প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাযার, যা ১৯৭১ সালে হয় ৮০ হাযার। অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রাক্কালে এদেশে মোট খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ২ লাখের মতো। ১৯৭৪ সালে হয় ২ লাখ ১৬ হাযার এবং ১৯৮২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৯০ হাযার। ক্যাথলিক ১ লাখ ৬০ হাযার এবং প্রটেস্ট্যান্ট ১ লাখ ৩০ হাযার। ১৯৭৭ সালে দেশের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৯০%। অথচ খৃষ্টান বৃদ্ধির হার ছিল ৩.২৫%।[৯] ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৩ লাখ ৫৭ হাযার। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। মিশনারীদের লক্ষ্য ৫০ লাখ লোককে খৃষ্টান বানানো। তারপর দেশের যেকোন একটি অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন দাবী করা হবে। পূর্ব তিমুরের মতো হয়ত প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো দ্রুত তাকে স্বীকৃতিও প্রদান করবে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে সমাজসেবার ছদ্মাবরণে এদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও আসতে থাকে। ১৯৭২ সালে সিলেটের সুল্লায় নব্য স্বাধীন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি' (ব্র্যাক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশী-বিদেশী মিলে দেশে প্রায় ৫১ হাযার এনজিও কাজ করছে। এনজিওগুলোর এদেশে আসার উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য আমরা এখানে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করছি। 'একটি নতুন জাতির জন্ম হয়েছে (নাম তার) বাংলাদেশ। (অতএব) মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচারের অপূর্ব সুযোগ এসেছে। আজ এই বাংলাদেশে খৃষ্টবাদের চেহারা অতি সমুজ্জ্বল। আসুন! আমরা প্রার্থনা করি, যেন প্রভু (যীশু) বাংলাদেশে নতুন নতুন দম্পতি প্রেরণ করেন। তাদের কাজ হবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। তারা কাজ করবে এমন জায়গায়, যেখানে আগে কোন

৯. *অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা, প্রকাশকাল: ১৯৮৪,পৃঃ ১৭, ২০-২২, ২৫।*

খৃষ্টান ছিল না। তারা যে শুধু ধর্মান্তরিত করবে তা নয়; বরং এমন সব লোকদের ধর্মান্তরিত করবে যারা অন্যদেরকেও ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হবে। এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য'।[১০] এনজিও সংস্থা 'হীড' প্রকাশিত ও প্রচারিত একটি লিফলেটে বলা হয়েছে, "If you can not come yourself, encourage others to accept the challenge of work in Bangladesh. Pray too for those working here... that through this work God will be glorified, and the name and love of Jesus Christ spread throughout the land." 'আপনি নিজে যদি এগিয়ে আসতে না পারেন তবে বাংলাদেশে কাজের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। যারা এখানে কর্মরত আছে তাদের জন্য প্রার্থনাও করুন। এই কাজের মাধ্যমে ঈশ্বর বন্দিত হবেন এবং যীশু খৃষ্টের নাম ও ভালবাসা এই দেশের সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়বে'। উল্লেখ্য, তিনদশক আগেও বিশ্বের মোট খৃষ্টান জনসংখ্যার ৮৫% বাস করত ইউরোপ-আমেরিকায়। এখন এ দু'টি মহাদেশে খৃষ্টানদের মাত্র ৩৫ শতাংশ বাস করে। বাকী ৬৫% খৃষ্টান ছড়িয়ে আছে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে।[১১]

এনজিওগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে মিশনারী তৎপরতা চালাচ্ছে অবলীলায়। আদিবাসী সাঁওতালদেরকে পাকা বাড়ীঘর করে দিয়ে দেশের অনেক স্থানে খৃষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। পার্বত্য এলাকায় এ অপতৎপরতা চলছে আরো তীব্রগতিতে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী দশ দিনের শিক্ষা সফরে আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্বত্য এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে স্থানীয় সচেতন লোকদের কাছে জানতে পেরেছি যে, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের উপজাতিদেরকে অর্থের প্রলোভন, ঘরবাড়ী তৈরী করে দেয়াসহ নানাবিধি ফাঁদ পেতে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। অথচ এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। প্রসঙ্গত, লন্ডনের বার্মিংহাম থেকে প্রকাশিত 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ' ব্রিটেনের মুখপত্র উর্দু মাসিক 'ছিরাতে মুস্তাকীম' একটি ফরাসী পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে, জনকল্যাণমূলক কাজের ছদ্মাবরণে পৃথিবীর ১৭০টি দেশে ১৬ হাযার খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক খৃষ্টান ধর্ম প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম দেশ রয়েছে। পত্রিকাটির তথ্য মতে, শুধু আফগানিস্তানেই দক্ষিণ কোরিয়ার ২ হাযার খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে নিরন্তর আফগান মুসলমানদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে।[১২] কুয়েত থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-ফুরক্বান' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আফ্রিকার আরব দেশগুলোতে (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া প্রভৃতি) ৯শ'র অধিক খৃষ্টান মিশনারী সংস্থা মুসলমানদের খৃষ্টান বানাতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। পত্রিকাটির বর্ণনা মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'কারিতাস' আলজেরিয়া ও মরক্কোতে পাঁচ হাযারের অধিক দরিদ্র শিশুকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছে।[১৩]

এনজিওগুলো নানাভাবে এদেশে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা চালাচ্ছে। বই প্রকাশ ও বিতরণ, লিফলেট বিতরণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বাড়ীঘর করে দেয়া, দরিদ্র মানুষকে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ ও বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে চলছে খৃষ্টান বানানোর তৎপরতা। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে আসা মি. বব ম্যাককেহিল তার 'জীবন সংলাপ: আল্লাহ্র ভক্তদের মাঝে একজন খৃষ্ট বিশ্বাসী' পুস্তকে লিখেছেন, 'অবহেলিত, রুগ্ন ও অক্ষম দীনহীনদের প্রতি প্রেমপূর্ণ সেবাই হচ্ছে সর্বাধিক শিক্ষাপ্রদ কর্মতৎপরতা, যা আমি বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি'। তিনি আরো বলেন, 'গরীব ও অশিক্ষিত লোকদের মাঝে একজন ভাই ও একজন প্রতিবেশীরূপে বাস করা ছাড়া কোন প্রেরণকর্মীর পক্ষে খৃষ্টধর্মের প্রতি কোন শিক্ষিত মুসলমানের সদয় চিন্তাধারার পরিবর্তন আনয়ন করার আর কোন ভাল পথ নেই। মিশনারীদের সম্বন্ধে শিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মনে যেসব ভুল ধারণা রয়ে গেছে, তা যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই, তাহ'লে আমরা সবচেয়ে ভাল যে কাজটি করতে পারি, তা হ'ল গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে থাকা ও তাদের পক্ষাবলম্বন করা। গরীবদের মাঝে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে আমরা একই সময় যারা গরীব নয় তাদেরকেও প্রভাবিত করে থাকি। অন্য যেকোন ধরনের সংলাপের চেয়ে জীবনধারা ও সেবাদানই শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে অধিকতর বাঞ্ছয় হয়ে ওঠে। যদি তারা বিদেশী খৃষ্টান প্রেরণকর্মীদেরকে গরীব মুসলমানদের মাঝে বসবাস করতে ও তাদের সেবা করতে না দেখে, তাহ'লে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পণ্ডিতদের পর্যায়ে যত সংলাপই হোক না কেন, তা তাদের অন্তরে বিদ্যমান সন্দেহের মূল উৎপাটন করার জন্য যথেষ্ট হবে না'। অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমার কুঁড়েঘরটি (কিশোরগঞ্জে) একটি গরীব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অবস্থিত। এর চারদিকে রয়েছে যত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তাহীন দিনমজুর ও রিক্সাওয়ালা। আমার সেবাদান মারাত্মকভাবে অসুস্থ, একমাত্র এমন সব গরীব মানুষদের জন্য সংরক্ষিত'।[১৪]

১০. *ঐ, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
১১. *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১, ৯ এপ্রিল '০৮, পৃঃ ৮।*
১২. *উর্দু মাসিক 'মাআরিফ', আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, জানুয়ারী '০৮, পৃঃ ৭১-৭২।*
১৩. *আল-ফুরক্বান, সংখ্যা ৪৮৩, ২৪ মার্চ '০৮, পৃঃ ৩০।*
১৪. *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২, ১১ জুলাই '০৬, পৃঃ ১৬-১৭।*

॥ পাঁচ ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর সেখানে সৃষ্টি হয় বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল। পর্তুগালের খৃষ্টান মিশনারীরাই প্রথম পর্তুগীজ বণিকের বেশে এদেশে আসে এবং ১৫১৭ সালে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ সালে ভাগীরথীর তীরে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি পায় এবং এটিই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ঢাকার অদূরে কালীগঞ্জে প্রথম গীর্জা নির্মাণ করে ও ঢাকায় খৃষ্টের বাণী প্রচার শুরু করে। পরে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। এভাবে তাদের বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার সমান তালে চলতে থাকে। এরা ছিল ক্যাথলিক খৃষ্টান। ১৬৭৭ সালে তারা ঢাকার ফার্মগেটের নিকটে 'চার্চ অব হোলি রোজারিও' প্রতিষ্ঠা করে। তেজগাঁওয়ের এই চার্চই বাংলাদেশের প্রাচীনতম চার্চ।[১৫]

পরে ইংরেজ খৃষ্টানরা বণিক সেজে এদেশে আসে। এরা বাংলার নবাবের কাছ থেকে এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি পায় ১৬৫০ সালে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১৬৯০ সালের ফরমান বলে ইংরেজরা বাৎসরিক ৩০০০ রূপির বিনিময়ে বাংলা ও উড়িষ্যায় অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে।[১৬] শুধু তাই নয়, তারা কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জায়গির লাভ করে। 'বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' বিজয়ী ঐতিহাসিক ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী এ সম্পর্কে বলেছেন, Aurangzeb's *farman* of 1690 allowed them to trade freely in Bengal and Orissa in lieu of an yearly payment of 3000 rupees and granted them the privilege of issuing *dastakhs* (clearance certificates) showing that the goods carried in a vessel belonged to the Company. They had also obtained zamindari rights over the three villages of Calcutta, Sutanuti and Govindpur and had fortified their settlements there.[১৭] মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনের শেষের দিক থেকেই তারা দেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করে। মোহর আলীর ভাষায়, During Murshid Quli khan's time they further improved their position, after some initial difficulties, and by the end of the period emerged as the most powerful European nation in Bengal ready to take part in the country's politics.[১৮]

১৫. *দরসে কুরআনঃ খ্রীষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০১, পৃঃ ৮।*
১৬. *Brijen K. Gupta, Sirajuddaullah and the East India Company, (Leiden: E. J. Brill, 1962), p. 5.*
১৭. *Dr. Md. Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, (Riyadh: Iman Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985). Vol. IA, p.559.*
১৮. *Ibid.*

তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন তখন তারা টের পাননি কি হ'তে কি হ'তে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি গল্প বেশ মনে পড়ছে। এক বাড়ীতে ডাকাতি করার জন্য ডাকাতরা যখন বাড়ীর সন্নিকটস্থ পুকুর পাড়ে এসেছিল তখনই গৃহস্থ তাদের আনাগোনা টের পেয়েছিল। কিন্তু সে তাদেরকে কিছু না বলে বৈঠকখানায় সরে এসেছিল। এরপর ডাকাতরা বাড়ীর উঠানে আসলে গৃহস্থ ঘরে ঢুকে পড়ল। এবার ডাকাতরা ঘরের দিকে এগিয়ে এলে গৃহস্থ টংয়ের উপর উঠল। ডাকাতরা ঘরে ঢুকে সব মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। আমাদের বর্তমান অবস্থাও তথৈবচ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছিল। এদের ষড়যন্ত্রেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ইংরেজরা আসীন হয় ভারতবর্ষের ক্ষমতার মসনদে। ১৯০ বছর চলে তাদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ। জনৈক কবি বলেছেন,

বণিকের মানদণ্ড
পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।

আর আশাহত-ভাগ্যাহত মুসলমানরা রাতারাতি পরিণত হয় ভিখেরীতে। W.W. Hunter ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন, A hundred and seventy years ago, it was almost impossible for a well born Musalman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich. '১৭০ বছর আগে বাংলায় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর জন্য ধনী হওয়া প্রায় অসম্ভব'।

আমরা হয়ত কালের বিবর্তনে এসব ইতিহাস বিলক্ষণ বিস্মৃত হয়ে গেছি। অথবা জেগে জেগে ঘুমোচ্ছি। হয়তবা তাই ব্র্যাকের আপাতমধুর মাকাল ফলসদৃশ শ্লোগান 'শিক্ষার মান্নোয়ন'-এ মুগ্ধ (?) হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা তাদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছি। আমাদেরকে এখনি সাবধান হতে হবে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্র্যাকের মত সংস্থাকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় খবরদারি করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে সরকারকে। দেশের বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, আলেম-ওলামা, গবেষক, কলামিস্ট, সাংবাদিক, আপামর জনগণ সবাইকে সজাগ থাকতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। আর যদি আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেই তাহ'লে ইতিহাস আমাদের কখনো ক্ষমা করবে না। পৃথিবীর এ যাবৎকালের ইতিহাসের এটিই নির্মম বাস্তবতা। অতএব, সাধু সাবধান!

Contents

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

আল্লাহ মানব জাতিকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন *(বনী ইসরাঈল ৭০)*। কিন্তু বর্তমানে মানুষ তলিয়ে গেছে অধঃপতনের অতল তলে। আল্লাহ যেজন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা পরিত্যাগ করে তারা আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়ের একটি হ'ল শিরক। আল্লাহ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক দূরীভূত করার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

'আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ত্বাগূতকে বর্জন করবে' *(নাহল ৩৬)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদত বলতে তাওহীদ ও ত্বাগূত বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে। আর শিরক হ'ল সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরকযুক্ত ছোট-বড় কোন আমলই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। শিরক সম্পর্কে জানা এবং এর ভয়াবহতা, অসারতার দলীল ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত যরূরী। কেননা মানুষের পক্ষে তা থেকে নিজে বেঁচে থাকা এবং অপরকে বাঁচানো তখনই সম্ভব, যখন ঐ বিষয়ের পূর্ণ ধারণা ও তার ভয়াবহতা এবং ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকবে।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ الصَّحَابَةُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُّدْرِكَنِىْ.

'ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উত্তম ও কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আর আমি জানতে চাইতাম, মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কে এ আশংকায় যাতে তা আমাকে পেয়ে না বসে'।[১] এ কথাটিই এক কবি তার ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন,

عَرَفْتُ الشَّرَّ لاَ لِلشَّرِّ وَلَكِنْ لِتَوَقِّيْهِ * وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعُ فِيْهِ

'আমি মন্দ সম্পর্কে জেনেছি মন্দ ও ক্ষতির উদ্দেশ্যে নয়; বরং তা হ'তে রক্ষা পেতে। কেননা যে লোক মন্দ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না সে তাতে পতিত হয়'।

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *বুখারী হা/৬৬৭৩; মুসলিম হা/১৮৪৭।*

আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য শিরক প্রচলিত আছে যেগুলি সম্পর্কে অনেকে জানে না। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে শিরকের ভয়াবহতা ও আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাহআল্লাহ।

শিরকের পরিচয়ঃ

'শিরক' (الشرك) শব্দটি কুরআন ও হাদীছে বহুল ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। মূল অক্ষর হ'ল (ش ر ك) অর্থ অংশীদার হওয়া, শরীক হওয়া। যেমন আরবীতে বলা হয়, شَارَكْتُ فُلاَنًا فِي الشَّيْءِ অর্থাৎ 'আমি অমুকের সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হয়েছি'।

আর কুরআন ও হাদীছে শিরক শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্র রুবূবিয়াত, উলূহিয়াত ও আসমা ওয়াছ ছিফাতের মধ্যে কাউকে অংশীদার বানানোকে বুঝানো হয়েছে।

শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন,

الشرك هو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله.

'শিরক হ'ল আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র মত তাকে ভালবাসা'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

'আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[৩]

শিরক হ'ল প্রতিপালন, আইন, বিধান ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলূহিয়্যাহ বা দাসত্বের ব্যাপারে অংশীদার সাব্যস্ত করা এভাবে যে, আল্লাহ্র সাথে অন্যকে আহ্বান করা অথবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা। যেমন- যবেহ করা, নযর বা মানত করা, ভয় করা, আশা করা এবং ভালবাসা।[৪]

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতিঃ

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হ'ল আল্লাহ্র একত্ববাদকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ মানুষকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন। আত্মার জগতে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তাওহীদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

২. *মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৩৯; মাসিক আল-বায়ান, সংখ্যা ৬৯, নভেম্বর ১৯৯৭।*
৩. *বুখারী হা/৪২০৭; মুসলিম।*
৪. *ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ, অনুবাদ: সাঈদুর রহমান, (ঢাকা: মসজিদ ও কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, ২য় সংস্করণ, ২০০২) পৃঃ ৬।*

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

'ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে, তারই জন্য নিজেদের আনুগত্য একান্তভাবে নিয়োজিত করে। পরে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করতে আরম্ভ করে' *(আনকাবূত ৬৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন,

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.

'মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে পড়ে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্কে ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে চলে যায় যেন মনে হয় তার কোন দুঃসময়ে আমাদের কাতরভাবে ডাকেনি। এ ধরনের সীমালংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(ইউনুস ১২)*।

এ ছাড়াও সূরা লোকমানের ৩২ নং আয়াতে, সূরা নাহলের ৪৩-৪৫ নং আয়াতে, বনী ইসরাঈলের ৬৭ নং আয়াতে ও সূরা রূমের ৩৩ নং আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হ'ল, এক আল্লাহ্কে বিশ্বাস ও তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। কিন্তু দুনিয়ার চাকচিক্য, শিক্ষা, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

শিরকের উৎপত্তিঃ

মানুষ যেমন জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময় তাওহীদের উপর থাকে তেমনি আদম (আঃ) থেকে ১০০০ বছর পরও মানুষ একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের অনুসারী ছিল। এ সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যকার ব্যবধান ছিল ১০ শতাব্দীর অর্থাৎ ১০০০ বছর। তারা সকলেই তখন একনিষ্ঠ ইসলামের অনুসারী ছিলেন, সে সময় কোন শিরক পৃথিবীতে ছিল না।[৬]

দুনিয়াতে প্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছিল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর তা হয়েছিল সৎ ও বুযর্গ লোকদের প্রতি অতি মাত্রায় ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ বলেন,

৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড, ২৩০ পৃঃ।*

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَي شَهِدْنَا.

'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি' *(আ'রাফ ১৭২)*।

সমস্ত মানুষ জন্মের সময়ও তাওহীদের উপর ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

'প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক করে গড়ে তুলে'।[৫]

আল্লাহ বলেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.

'শপথ মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তার পাপ ও তার পরহেযগারিতার প্রতি ইলহাম করেছেন' *(শামস ৭-৮)*।

আর মানুষ পৃথিবীতে আসার পর মানুষের প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, সে প্রকৃতি অনুসরণ কর যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটা সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(রূম ৩০)*।

তাছাড়া মানুষ যখনই বিপদ-আপদ ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে, ঠিক সে মুহূর্তেই মানুষ আল্লাহমুখী হয়ে পড়ে। তখন একান্তভাবে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন করে। তার মাধ্যমেই মানুষের ভিতর নিহিত প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। চীৎকার করে ওঠে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যের জন্য। কেননা সে মুহূর্তে আর কেউ তাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে এমন কথা সে বিশ্বাস করতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

৫. *বুখারী হা/১৩৮৫, বঙ্গানুবাদ বুখারী, (আধুনিক প্রকাশনী) হা/১২৯৪, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) হা/১৩০২।*

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

'তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না, আর তোমরা ওয়াদ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক এবং নাসরাকেও ত্যাগ কর না' *(নূহ ২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحي الشيطان إلي قومهم أن أنصبوا إلي مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم وعبدت.

অর্থাৎ (এ আয়াতে যে ক'টি নাম এসেছে) এগুলো নূহ (আঃ)-এর কওমের বুযর্গ লোকদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররোচিত করল, তারা যেন ঐ সব বুযর্গগণ যেসব আসরে বসতেন, সেখানে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদের নামে এগুলোর নামকরণ করে। তারা তাই করল। তবে এগুলোর উপাসনা করা হ'ত না। এসব লোক মৃত্যুবরণ করার পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হ'ল, তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা হ'তে লাগল'।[৭]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তখনকার যুগে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, এরা যে স্থানে বসতেন তোমরা সে সব স্থানে কিছু মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নামে সে সবের নামকরণ করে দাও। তখন তারা তাই করে। তখনও কিন্তু এগুলির পূজা শুরু হয়নি। তারপর তাদের মৃত্যু হয় এবং ইলম লোপ পায়। তখন থেকে সে সবের পূজা শুরু হয়। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকজন পুণ্যবান লোক ছিল, তাদের বেশ কিছু অনুসারীও ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয়, তখন তাদের অনুসারীরা বলল, আমরা যদি তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করে রাখি তাহ'লে তাদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং অন্য প্রজন্ম আসে তখন শয়তান তাদের প্রতি এ বলে প্ররোচনা দেয় যে, লোকজন তাদের উপাসনা করত এবং তাদের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তখন তারা তাদের পূজা শুরু করে দেয়।[৮]

নূহ (আঃ)-এর আগমনের পর সকল মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

'আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করলাম। সতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৫৯)*।

নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর তাওহীদের দাওয়াত দিলেন কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত কেউই তাঁর অনুসরণ করল না। পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নূহ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে রক্ষা করলেন এবং অন্যদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেললেন। ফলে পৃথিবীতে পুনরায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

অতঃপর আদ জাতির আবির্ভাব ঘটল। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নূহ (আঃ)-এর পর হূদ (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারাও তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় নূহ-এর পথ ও মত অনুসরণ করতে গিয়ে অবাধ্যতা, কুফরী ও ভ্রষ্টতার পথকেই বেছে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করে তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। অল্প কিছু লোক যারা হূদ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল তারা ছাড়া কেউই এ ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পায়নি। এরপর আগমন ঘটে ক্বাওমে ছালেহের, যারা ছামূদ নামে পরিচিত। তারাও তাদের পূর্ববর্তী দুই উম্মত তথা নূহ ও হূদ (আঃ)-এর জাতির রীতিনীতিকেই অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়ে হক্ব ও সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল। ফলে আল্লাহ পাকও ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাতে তাদের সবাইকে নির্মূল করে দিলেন এবং ছালেহ (আঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কিছু মুমিন ব্যতীত কেউই এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পেল না।[৯]

পুনরায় পৃথিবীতে শিরক শুরু হ'ল মূসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে। ফির'আউন নিজেকে বড় রব দাবী করার মাধ্যমে শিরকের প্রচলন করল। মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলে এবং নীল নদীতে ফির'আউন ও তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতাসহ সমস্ত জাতি মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলে পুনরায় মানুষ তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী হ'ল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তারা দ্বীনের শিক্ষা ভুলে যেতে থাকল। তবুও তাদের মধ্যে তাওহীদের আলো এবং ইবরাহীমের শিক্ষা কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে বনু খোযা'আ গোত্রের সরদার আমর ইবনু লোয়াই দৃশ্যপটে এলো। ছোট বেলা থেকে এ লোকটি ধর্মীয় পুণ্যময় পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল অসামান্য। সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধার চোখে

৭. *বুখারী হা/৪৯২০।*
৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।*
৯. *শাইখ মানছুর আবদুর রহমান আল-আক্বীল, আক্বীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুবাদ: যাকারিয়া বিন খাজা আহমাদ ইকবাল হোসাইন মামুন, (গাযীপুর: আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০০১, পৃঃ ৩৪,৩৫।*

দেখত। নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মনে করে তারা তার অনুসরণ করত। এক পর্যায়ে এই লোকটি সিরিয়া সফর করে। সেখানে মূর্তিপূজা করা হচ্ছে দেখে সে মনে করল এটাও বুঝি আসলে একটা ভাল কাজ। সিরিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই সিরিয়ার জনগণ যা করছে সেটা নিশ্চয়ই ভাল এবং পুণ্যের কাজ। এরূপ চিন্তা করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সে হোবাল নামের এক মূর্তি নিয়ে এলো এবং সেই মূর্তি কা'বা ঘরের ভেতরে স্থাপন করল। এরপর সে মক্কাবাসীকে সেই মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে শিরক করার আহ্বান জানাল। মক্কার লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ডাকে সাড়া দিল। মক্কার জনগণকে মূর্তিপূজা করতে দেখে আরবের বিভিন্ন এলাকার লোক তাদের অনুসরণ করল। বৃহত্তর আরবের লোকেরা কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদেরকে মনে করত ধর্মগুরু। এ কারণে তারা মূর্তিপূজায় মক্কার লোকেদের অনুসরণ করল। এমনিভাবে আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়।[১০]

আরবের লোকেরা শুধু মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল না, মূর্তিপূজার সাথে সাথে বড় বড় মাছ, গাছ, পাহাড়, পর্বত, সাগর, নদী, আগুন ও সূর্যের পূজাও করত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সারা জীবন দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজের শিরক নির্মূল করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা ঘরের সমস্ত মূর্তি ভেংগে সেখানে ছালাতের আযান দেওয়ার মাধ্যমে শিরক দূর করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও শিরকের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, কতিপয় মানুষ ঐ বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করে যাতায়াত করে। যে বৃক্ষের নীচে নবী (ছাঃ)-এর হাতে ছাহাবীগণ বায়'আত করেছিলেন। অতঃপর তিনি (ওমর) ঐ বৃক্ষকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন'।[১১] কিন্তু বর্তমানে আমরা রাসূলের উম্মত হয়ে জেনে না জেনে, সংস্কৃতির নামে, আধুনিকতার নামে অহরহ শিরক করে চলেছি।

স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও শহীদ দিবস আসলে আমরা শহীদ মিনারে ও স্মৃতি সৌধে গিয়ে ফুলের মালা দেই, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরী করে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিরক শিক্ষা দিচ্ছেন। অথচ সবচেয়ে বড় গুনাহ এ শিরক থেকে বেঁচে থাকার যথার্থ শিক্ষা দেয়াই উচিত ছিল এদেশের তরুণ প্রজন্মকে।

[চলবে]

১০. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, পৃঃ ৫৩।
১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ; ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ।

প্রসঙ্গঃ নারীর সমঅধিকার

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

পুরুষের সমতুল্য অধিকার সর্বপ্রথম যে নারী দাবী করেন তার নাম মেরী ওলস্টোন ক্রাফ্ট (Marry Olstone Craft)। তিনি ইউরোপের ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। নারী অধিকার সম্পর্কে তিনি তার মাতৃভাষা ইংরেজীতে যে পুস্তকটি রচনা করেন তার নাম 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ওম্যান' (A Vindication of the Rights of Woman)। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। এর দেড়শতাব্দী পরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপেরই ফরাসী দেশের লেখিকা সিমোন দ্য বেভোয়ার (Semone De Beawoir) লেখেন ফরাসী ভাষায় 'ল্য দজিয়েম সেক্স' (Le Deuxieme Sexe)। ইউরোপের দুই দেশের দুই যুগের এই দুই মহিলা ছিলেন সমঅধিকারের দাবীদার। সমঅধিকার মানে রাষ্ট্রে, সমাজে সর্বত্রই নারীদের পুরুষের তুল্য অধিকার থাকা। সেকালে ইউরোপীয় খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী অধিকাংশই তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বিশেষত পুরুষেরা। অবশ্য কতিপয় সমর্থকও তাদের জুটেছে। কেননা অবাধে নারীদেহ সম্ভোগের সুযোগ কারো কারো কাছে পসন্দনীয় ছিল। উভয়েরই বিবাহে আপত্তি ছিল। মেরী বিবাহ বিহীন দু'জন পুরুষের সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছেন। দু'জনের ঔরসে দু'টি মেয়েও জন্মেছে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে সন্তান প্রসবকালে তার মৃত্যু হয়। সিমোন বেভোয়ার দীর্ঘায়ু ছিলেন। তিনি বহু পুরুষের অংক শায়িনী হয়েছেন। কিন্তু সন্তানের ঝামেলা তার অপসন্দনীয় ছিল। তাই গর্ভ সঞ্চার হ'লে গর্ভপাতের আশ্রয় নিয়েছেন। এভাবেই পাশ্চাত্য দেশে নারীর সমঅধিকারের সূত্রপাত। অতঃপর তার বিস্তৃতি।

নারীবাদীদের থিয়োরি হ'ল 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে'। এই নারী হয়ে ওঠার জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র। সুবিধাবাদী পুরুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে নারী করে রাখছে। বস্তুতঃ তারাও পুরুষের মতই মানুষ। পুরুষই তাদেরকে মানুষের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এ ধারণা নারীবাদীদেরই। অবশ্য এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই নারী এবং পুরুষকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের মধ্যে দৈহিক ও মানসিকভাবে কিছু পার্থক্যও রেখেছেন, যাতে পুরুষ এবং নারীকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায়। এ ব্যাপারে পুরুষ কিংবা পুরুষতন্ত্রের কোন হাত নেই। যদি থাকে তাহ'লে একজন নারী অবয়বধারিণীকে কেউ পুরুষ বানিয়ে ফেলুক। নিশ্চয়ই এটা কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন- মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য, তেমনি পুরুষ-নারী বানানো মানুষের অসাধ্য। যে যেমন জন্মে, সে তেমনই থাকবে। জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। নারীরা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে পুরুষের মত চুল ছেঁটে খাটো করতে পারে, পুরুষের পোষাক পরিধান করতে পারে, পুরুষের মত সব কাজ করতে পারে। কিন্তু পুরুষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মাসিক ঋতুচক্র সে এড়াতে পারবে না। তার স্ফীত বক্ষ সে সমতল করতে পারবে না। পুরুষ সংসর্গে গর্ভধারণের সম্ভাবনা এড়াতে পারবে না। তাহ'লে সে নারী হয়ে জন্মায় না বলেই তা সত্যি হবে?

পাশ্চাত্যের মহিলারাই সর্বপ্রথম নারী অধিকার নিয়ে কলম ধরেছিল। তাদের প্রধান দাবী পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি। এই মুক্তির অন্তরায় বিবাহ। তাই বিবাহে তাদের আপত্তি। তাদের বিবাহ মানে বন্ধন, পুরুষের অধীনতা, দাসত্ব। এ থেকে মুক্তি না পেলে নারীর পুরুষতন্ত্রের খড়্গ থেকে নিস্তার নেই। আর সন্তান ধারণ (গর্ভে) এবং সন্তান পালনও দাসীত্বের লক্ষণ। নারীবাদী এ থেকেও মুক্তি চায়। এটাকে বলে তারা জরায়ুর স্বাধীনতা। প্রকারান্তরে যৌন স্বাধীনতা। এই মুক্তি তথা অধিকারকামী নারীরা কাম-কাতর কিছু অল্প নয়; বরং প্রবলভাবে কামাসক্ত। শুধু ধর্ম-নীতি-সমাজ এসব তারা মানতে নারায। এইসব গণ্ডীর বাইরে থেকে তারা চুটিয়ে যৌন সুখ উপভোগ করবে। যাকে বলে উচ্ছৃংখল যৌনতা। এতে অবগাহনে বাধা হবে না কিন্তু থাকবে না পুরুষের কর্তৃত্ব। বিবাহ নয়, সন্তান ধারণ নয়, যেমন পানিতে সাঁতার কাটা, সিক্ততাবিহীন। তা কি কখনও হয়? এটা অসম্ভব। তাই দেখা যায়, বিবাহ বিহীন যৌন সংসর্গেও গর্ভধারণ আটকায় না। পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞ দার্শনিক, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তান। ভারতীয় পুরানেও এরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। মুক্তিকাম নামক এক ঋষিপুরুষ জারজ সন্তান ছিলেন। তিনি তার মাকে পিতার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় মায়ের উত্তর-

'বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোমা
পিতৃ পরিচয় নাহি জানি।'

শুনেছি, যৌন স্বাধীনতার সবচাইতে শীর্ষস্থানীয় দেশ ফরাসীতে মাতার পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হয়। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও অতটা অগ্রসর হয়নি। তবে পিতার নামের সঙ্গে মাতার নামও সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে অধুনা উল্লেখ করতে হয়। এতে নারীর মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি হয়, তা আমার বোধগম্য নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে নারী মুক্তির আন্দোলন শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু নারীদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তা রোধ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন পাশ করান আন্দোলনের

* সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।

মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীকে অবরোধে থাকার বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। সেকালে মুসলমান সমাজ নারী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। তিনি নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার পথ সুগম করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার আন্দোলন ছিল নারী শিক্ষা, নারীর অবরোধ থেকে মুক্তি এবং নারীর কর্মসংস্থানের দাবী নিয়ে। অবশ্য তিনি যৌন স্বাধীনতা, জরায়ুর স্বাধীনতা চাননি। তিনি বিবাহের বিরোধিতাও করেননি। তিনি লিভ টুগেদারের কথাও বলেননি। যদিও তাঁর লেখনী কিছু কিছু ইসলাম পরিপন্থী কথা লিখেছে, তবু কোথাও চরম উচ্ছৃংলতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি স্বয়ং পর্দাহীনভাবে যথেচ্ছাচারিণী ছিলেন না। তাই তাকে পাশ্চাত্যের মেরী ওলস্টোন ক্রাফট কিংবা সিমোন দ্য বেভোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তিনি কতকটা রক্ষণশীল নারীবাদী ছিলেন। আর মেরী ও বেভোয়ার তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে স্বেচ্ছাচারিণী এবং নীতির দিক দিয়ে ব্যভিচারিণী রমণী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে যে নারীবাদী বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আবির্ভূত হয়, তার নাম তসলিমা নাসরিন। সে পেশায় ছিল একজন এম.বি.এস. ডিগ্রীধারী মেডিকেল অফিসার। সে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করে নারী অধিকার নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে ব্যভিচারিণী যৌন স্বাধীনতার পক্ষপাতী এক নাস্তিক রমণী সে। তার লেখনী থেকে নির্গত হ'তে থাকে চরম অশ্লীল, ধর্ম এবং সমাজ বিরোধী নীতিগর্হিত রচনাবলী। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শারঈ বিধানকে অস্বীকার করে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ইঙ্গিত শুধু নয়, স্পষ্টভাবে বক্তব্য রেখেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কারণে দেশের দ্বীনদার মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সে প্রাণভয়ে দেশ ত্যাগ করে। বর্তমানে সে বিদেশে অবস্থান করে ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে বিষোক্তিকরণ করে যাচ্ছে। মুসলমানদের কুরআন-ঘোষিত মহাশত্রু ইহুদী-খ্রীষ্টান-মুশরিকরা তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করে তাকে উৎসাহিত করছে।

তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য অনুসারে ইসলাম পুরুষের প্রতি পক্ষপাত করে নারীকে যথেষ্ট ঠকিয়েছে, যথা-

(১) নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের অর্ধেক।
(২) পুরুষকে এক সঙ্গে চারটি বিবাহের অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নারীকে সে অধিকার দেয়া হয়নি।
(৩) নারীর নিজ ক্ষমতায় তালাকের অধিকার দেওয়া হয়নি।
(৪) পুরুষের জন্য পর্দা প্রথা নেই, কিন্তু নারীকে পর্দার বিধান দিয়ে তার অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ করেছে।
(৫) বিবাহ প্রথা দ্বারা নারীকে পুরুষের অধীন করা হয়েছে।
(৬) নারীকে একাকী যথেচ্ছ চলাফেরার অনুমতি না দিয়ে তাকে পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।
(৭) সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে দু'জন নারীকে একজন পুরুষের সমান করে নারী-পুরুষে বৈষম্য রাখা হয়েছে।
(৮) নারীকে ইমামতী ও নেতৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশের একদল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী পুরুষ ও কতক রমণী এবং যারা নাস্তিক্যবাদী, তারাও তসলিমা নাসরিনের সমর্থক। যারা ধর্ম মানে না, তারা অবশ্যই নীতিহীন, আদর্শ বিচ্যুত। তাদের পক্ষে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য হ'তেই পারে। তারাতো ইসলামের দুশমন। এই ধারার পুরুষ-নারীরা নারীর জন্য অন্যান্য অধিকার দাবী করতেই পারে। তারা কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক শারঈ আইনের মর্তবা বুঝবে না। আর এই ধরনের নারীরাই বলে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে। তারাই বিবাহকে ভাবে নারীর অধীনতা, দাসত্ব। সম্প্রতি নারীরা সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের দাবী তুলছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীকে ঠকানো হয়েছে কি-না, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

ছেলে পিতার সম্পত্তি মেয়ের দ্বিগুণ পায়। এই সম্পত্তি পেয়ে তাকে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা জীবিত থাকলে তারও ভরণ পোষণের দায়িত্ব ছেলের উপরে বর্তায়। মেয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি ছেলের অর্ধেক পায়। বিবাহের মাধ্যমে সে নগদ মোহরানা বাবদ স্বর্ণালংকার এবং টাকা (বাকী মোহরানা যা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য) পায় স্বামীর পক্ষ থেকে। এই সম্পদ দ্বারা তার প্রতি কাউকেই ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তার প্রাপ্য সম্পদ জমাই থাকে। তার কোন কমতি নেই। এ সম্পদ থেকে সে স্বেচ্ছায় ব্যয় করার ক্ষমতা রাখে। কারো ইচ্ছায় ও নিজের অনিচ্ছায় তা ব্যয়িত হবে না কখনও। তার এবং তার গর্ভজাত সন্তানদের ভরণ-পোষণের সব দায়িত্ব স্বামীর। তাহ'লে তাকে ঠকানো হ'ল কেমন করে? এখন ধর্মবিধি বহির্ভূত সমঅধিকার-সচেতন নারীরা যদি বলে, নারী কেন পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবে? এটা অধীনতা এবং দাসত্ব। তাহ'লে বলব যে, দুনিয়ার নিয়মই এ রকম। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার খাতিরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অধীনতামূলক মিত্রতার অধীন। এর ব্যতিক্রম হ'লে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায়। আমরা দুনিয়াতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করেছি, তাতেও মানুষ কিছু বিধি বিধানের অধীন বসবাস করে। এ ব্যবস্থা না থাকলে পৃথিবীতে বিশৃংখলতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের সরকারের অধীনতা স্বীকার করেই বসবাস করতে হয়। তাকে কেউ অধীনতা বা দাসত্ব বলে না। পরিবারও একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখানেও একজন

কর্তাব্যক্তি থাকবেন। তিনি পরিচালনা করবেন সংসার। অবশ্য তিনি খামখেয়ালী হবেন না। যেমন সরকারের স্বৈরাচারী হবার কথা নয়। পরিবারে পুরুষের কর্তৃত্বকে এই নযরে দেখলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীকে ঠকানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবাধ নারী অধিকার ব্যভিচারই বৃদ্ধি করে। নারীদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই কামনা করি।

পরহেযগার মুসলমান হ'তে হ'লে অবশ্যই সাচ্চা ঈমানদার হ'তে হবে। ঈমানদার মুসলমানকে মৌখিক বললেই হবে না, বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকতে হবে এই কথায় 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাহিতি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত'। কুরআনপাকে আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। তিনি মানুষের আবাদ করার জন্য আদম (আঃ)-কে প্রথম সৃষ্টি করেন। তাঁর থেকে সংগিনী হিসাবে বিবি হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। জান্নাতে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এই যুগল মানব-মানবীকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে মানবের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাদের জন্য) নিজের ধন ব্যয় করে। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুমমত চলবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ্র হেফাযতে (মান-ইয্যত) রক্ষা করবে। আর যে নারীদের কু-স্বভাবের আশংকা কর, তাদেরকে নছীহত কর। (যদি না মানে) তাদের এক শয্যায় শয়ন বন্ধ কর এবং (তাতেও যদি সংশোধন না হয় তবে) তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু যদি তারা তোমাদের কথা মান্য করে, তবে তাদের উপর (অত্যাচারের) কোন বাহানা খুঁজিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও মহান' *(নিসা ৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ইনসাফ-বাক্যের মধ্যে পুরুষের প্রতি পক্ষপাত এবং নারীর প্রতি অবিচার দেখতে পায় তারা, যারা নির্বোধ। তারা এর সদর্থ খুঁজে পায় না। পার্থিব জগতে শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে বসবাসের জন্য কারো না কারো নেতৃত্ব স্বীকার করতে হয় এবং কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। পরিবারে একজন কর্তার কর্তৃত্ব থাকে। গ্রামের সমাজে এক বা একাধিক মাতব্বর থাকে, তাকে মান্য করে চলতে হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রশাসনের অধীন সকল মানুষ। প্রশাসন পরিচালনায় কারো না কারো নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। এই নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অমান্যকারীকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাকে আমরা কখনও অন্যায়, অবিচার ভাবি না। তাহ'লে আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্র আইনকে কেন অমান্য করব? আল্লাহ্র আইন মানার মধ্যেই ইহকাল এবং পরকালের শান্তি নিহিত রয়েছে। এটা ঈমানদার মুসলমানদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। বস্তুতঃ নারীকে শারঈ আইন তার ন্যায়তঃ প্রাপ্য থেকে আদৌ বঞ্চিত করেনি। যা দেয়নি, তা তার প্রাপ্য নয়।

মানুষের রচিত আইন লংঘন করা যায় না। কেননা আইন রক্ষাকারীরা তাতে বাধা দেয় এবং বিচারকের দণ্ডও রেহাই দেয় না। কিন্তু আল্লাহ্র আইন অমান্য করলে আল্লাহই তাৎক্ষণিকভাবে দণ্ড দেন না। কিন্তু আল-কুরআনে আইন অমান্যকারীর কঠোর দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। সেই দণ্ড মানুষের দণ্ডের চাইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ কঠোর। তবে সেই শাস্তি পরকালের জন্য বরাদ্দ করা রয়েছে। আর ইহকালেও আইন অমান্যকারীরা তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ করে থাকে। অবাধ যৌনতা অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্তরা পরিণামে সিফলিস-গণোরিয়া-এইড্স ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলি আমরা অবাধ যৌনাচারের ফসল বলে স্বীকার করি। তাহ'লে পাপের কিছু জাগতিক ফলও ভোগ্য হয়, তা না মেনে উপায় কি? লিভ টুগেদার যে দীর্ঘ মেয়াদী এবং সুখকর হয় না, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। নারীর তালাকের অবাধ অধিকার পাশ্চাত্যের বিবাহ-প্রথাকে খেলায় পরিণত করেছে। সেখানে ঘন ঘন বিবাহ এবং তালাক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সংসার জীবন সেখানে অশান্তিময়, ক্লেদাক্ত। লিভ টুগেদার জারজের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। জন্মকে অবৈধ পন্থায় নিচ্ছে। এসব যথেচ্ছাচার পাশবিক। এসব পশুদের যোগ্য। সামাজিক জীব মানুষের জন্য ধর্মবন্ধন থাকা আবশ্যক। আর এ বন্ধনই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান॥

চিকিৎসা জগত

টাইফয়েড জ্বর : চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার মান তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। তাই এখানে টাইফয়েডের রোগ-জীবাণু সহজেই সংক্রমিত হয়। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশে প্রতি বছর গড়ে ১ হাযার জনের মধ্যে ৪ জন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। আর ৫ বছর বয়সের নীচের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি বছর গড়ে ১ হাযার জনের মধ্যে ১৯ জন টাইফয়েডে ভোগে। অর্থাৎ অন্যান্য অনেক রোগের মত টাইফয়েডের হুমকিও শিশুদের জন্যই বেশী। উন্নত বিশ্বে যথাযথ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার কারণে তারা প্রায় টাইফয়েডমুক্ত।

টাইফয়েডের জীবাণু দূষিত পানি ও দূষিত খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। মাছি এ রোগ বিস্তারে বেশী দায়ী। শুষ্ক মৌসুমে পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে কিংবা বর্ষা মৌসুমে পানিবাহিত রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই এ দুই মৌসুমেই এই রোগ বেশী হয়।

টাইফয়েড মূলতঃ পরিপাকতন্ত্রের রোগ। কোন জ্বরই নিজে কোন রোগ নয়; বরং অন্য কোন রোগের উপসর্গ হিসাবে শরীরে জ্বর আসে। এ রোগের জীবাণু দ্বারা পরিপাকতন্ত্র সংক্রমিত হয়। আর এ কারণেই জ্বর হয়।

লক্ষণঃ

টাইফয়েড রোগের সূচনাটা একটু কপট ধরনের অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত স্পষ্ট কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগ শুরুর দিকে চাপা অস্বস্তি, মাথা ব্যথা, ঝিমঝিম করা, শরীরময় ব্যথা ইত্যাদি অনুভূত হয়। সাধারণতঃ জ্বর একটু বাড়ে, পরে আবার একটু কমে। এভাবে ক্রমাগত বাড়া-কমার মাধ্যমে প্রথম সপ্তাহে জ্বর মোটের ওপর বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তাপমাত্রা বাড়া-কমার মাধ্যমেও মোটামুটি একটা সীমার মধ্যে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে বাড়া-কমার মাধ্যমে জ্বর কমতে থাকে। ডায়রিয়া বা বমি হ'তে পারে। কখনো কোষ্ঠকাঠিন্যও হ'তে পারে। পেট ফেঁপে ওঠে, কাশি হয়, প্লীহা বড় হ'তে পারে। পেটের ওপরের দিকে বা পিঠে লালচে দাগ হ'তে পারে, যা একটু চাপ দিলে হালকা হয়ে যায়। রোগী প্রলাপ বকতে পারে, এমনকি অচেতনও হ'তে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষাঃ

রক্তের সাধারণ পরীক্ষা করতে হবে। প্রথম সপ্তাহে রক্ত কালচার করলে জীবাণু পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য রক্তের কালচারে প্রথম সপ্তাহের পরও জীবাণু পাওয়া যায়। বহুল প্রচলিত ভিডাল টেস্টের মাধ্যমে দ্বিতীয় সপ্তাহে জীবাণুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। তবে এ পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিত কোন তথ্য দেবে না এবং এ ফলাফলে যথেষ্ট সংশয়ের বিষয় রয়েছে। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পায়খানা কালচারেও জীবাণু পাওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ

চিকিৎসার জন্য শরীরে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আছে কি-না তা পরীক্ষা করা উচিত। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স থাকলে শরীরে কোন কোন ওষুধ কারো কারো উপর কোন কাজ করবে না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫০ ভাগের কম ক্ষেত্রে এম্পিসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজল, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি কাজ করেছে, ৯৮ ভাগের ক্ষেত্রে সেফট্রায়োক্সোজন কাজ করেছে এবং সবক্ষেত্রেই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন কাজ করেছে। চিকিৎসক সার্বিক বিবেচনা করে ওষুধ দেবেন। বিভিন্ন ওষুধে রেজিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে সেফট্রায়োক্সোন ব্যবহার করা যায়। রোগের মেয়াদ দীর্ঘ হ'লে বা রোগী খুবই কাতর হ'লে স্টেরয়েড দেয়া যেতে পারে।

টিকাঃ

বর্তমানে এ রোগের টিকা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যে টিকা নেয়াই সবচেয়ে ভাল।

জটিলতাঃ

উপযুক্ত চিকিৎসা না হ'লে টাইফয়েড সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরী করতে পারে। পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্তপাত হ'তে পারে, এমনকি পরিপাকতন্ত্র ছিদ্র পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এ রোগের কারণে হাড় বা সন্ধিতে প্রদাহ, মেনিনজাইটিস, পিত্তথলিতে ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোঁড়া, স্নায়বিক সমস্যা ইত্যাদি হ'তে পারে। বিভিন্ন জটিলতা থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে।

প্রতিরোধঃ

বিশুদ্ধ পানি পান, খাবার পরিস্কার রাখা, পাস্তুরিত বা ফুটানো দুধ খাওয়া, স্বাস্থ্যকর বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। মোটকথা টাইফয়েড রোগ নিরাময়ে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। খাবার ও পানীয়ের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমেই এই জটিল রোগ এবং এর ভয়াবহ জটিলতা এড়ানো সম্ভব। শিশু-কিশোরদের জন্য এ রোগে বিশেষ সতর্কতা একান্ত আবশ্যক।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

বাংলাদেশের ফলের পুষ্টি ও ভেষজগুণ

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ রকমের ফলের আবাদ হয়ে আসছে। দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া ঔষধি হিসাবেও ফলের অবদান অনস্বীকার্য। উচ্চ পুষ্টি মূল্য ও ভেষজ গুণাবলীর অধিকারী হ'লেও ফলের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে বিভিন্ন ধরনের ফল ১০০ গ্রামের মত খাওয়া আবশ্যক। অথচ ফলের প্রাপ্যতা মাত্র ৩৫ গ্রামের মত, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। এ দেশে উৎপন্ন ফলের শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত ফলের সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশে উৎপাদনশীল গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলোর পুষ্টি ও ভেষজগুণ আলোকপাত করা হ'ল।

আমঃ আম ফলের রাজা। এটি একটি উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় ফল। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমে ৯০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২০ গ্রাম শর্করা, ১ গ্রাম আমিষ, ১৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন এবং ০.৭ গ্রাম চর্বি বিদ্যমান। রাতকানা ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ, ল্যাকজেটিভ, মুখরোচক, টনিক, বলকারক, রক্ত পড়া বন্ধকরণ ও যকৃতের জন্য এ ফল উপকারী। আম পাতার রস প্রস্রাবের জ্বালা, পাতলা পায়খানা, পুরাতন আমাশয়, দাঁতের ব্যথায় উপশমকারক। আমের শুকনা মুকুল পাতলা পায়খানা ও প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা নিরাময়ক। জ্বর, বহুমূত্র, বুকের ব্যথা নিরাময়ে আমের পাতার চূর্ণ বিশেষ উপকারী। পা ফাটা, পুরনো ক্ষত ও চুলকানিতে আমের আঠা লাগালে নিরাময় হয়। আমের আঁটির শাঁসের রস মাথার চুল ওঠা বন্ধ করে ও খুসকি কমায়।

কাঁঠালঃ কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। সম্ভবতঃ এটি বিশ্বের বৃহত্তম ফল। কাঁঠালের প্রতিটি অংশই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠালে ৪৮ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৯.৯ গ্রাম শর্করা, ১.৮ গ্রাম আমিষ, ২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৪৭০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বিদ্যমান। কাঁঠালের শিকড়ের রস জ্বর ও পাতলা পায়খানা নিরাময় করে। পাতা পোড়া ছাই ভুট্টা ও নারিকেলের খোসার সাথে পুড়িয়ে নারিকেলের তেলের সাথে মিশিয়ে মাখলে ক্ষত শুকিয়ে যায়। কাঁঠালসত্ত্ব পেটের পীড়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

পেঁপেঃ পেঁপে বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ফল। সবজি হিসাবেও পেঁপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। পেঁপে স্বল্পমেয়াদি, সুস্বাদু, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণাবলীসম্পন্ন। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা পেঁপেতে ৪২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৮.৩ গ্রাম শর্করা, ১.৯ গ্রাম আমিষ, ৩১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৫৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৮১০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বিদ্যমান। কাঁচা পেঁপেতে 'পেপেইন' নামক হজমকারী দ্রব্য রয়েছে, যা খাদ্যদ্রব্য হজমে সহায়তা করে এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অজীর্ণ, আলসার, একজিমা, কৃমির উপদ্রব, ত্বকের ক্ষত, যকৃতের জটিলতা, আন্ত্রিক ও পাকস্থলীর ক্যান্সার, ডিপথেরিয়া নিরাময়ে পেঁপে বিশেষভাবে উপকারী। কাশির সাথে রক্ত পড়া, রক্ত অর্শ্ব, মূত্রনালীর ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য দমনে পেঁপের উপকারী ভূমিকা রয়েছে।

কলাঃ কলা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। সারা বছর প্রচুর উৎপন্ন হয় বলে ধনী-গরীব সবাই এ ফল খাওয়ার সুযোগ পায়। কলা একটি সস্তা ও সহজপ্রাপ্য ফল। সস্তা হ'লেও পুষ্টি মূল্য ও গুণাগুণের দিক দিয়ে কলা উন্নতমানের একটি ফল। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কলাতে ১০৯ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২৫ গ্রাম শর্করা, ০.৭ গ্রাম আমিষ, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ১৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৯ মিলিগ্রাম লৌহ, ২৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। রোগীর পথ্য হিসাবে কলার ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। কাঁচা কলা ডায়রিয়া ও পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কলার মোচা ও শিকড় ডায়াবেটিস, আমাশয়, আলসার, পেটের পীড়া নিরাময়ে উপকারী। রক্ত আমাশয় ও কৃমি দূরীকরণে কলার ব্যবহার আছে।

পেয়ারাঃ পেয়ারা বাংলাদেশের একটি পরিচিত দ্রুতবর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। দেশের সকল অঞ্চলেই পেয়ারা ভালভাবে জন্মে থাকে। পেয়ারাকে অনেকে বাংলার আপেল বলে থাকেন। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে ৫১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১১.২ গ্রাম শর্করা, ০.৯ গ্রাম আমিষ, ৫.২ গ্রাম আঁশ, ০.৩ গ্রাম চর্বি, ১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৪ মিলিগ্রাম লৌহ, ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বিদ্যমান। পেয়ারার শিকড়, ডালের বাকল, পাতা ও অপরিপক্ব ফল কলেরা, আমাশয়সহ পেটের অন্যান্য পীড়ায় বেশ উপকারী। পেয়ারার পাতার রস দাঁতের ব্যথা উপশম করে। ঘা বা ক্ষতে পেয়ারা পাতার প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

লিচুঃ লিচু বেশ পুষ্টিসমৃদ্ধ সুস্বাদু ও লোভনীয় ফল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎকৃষ্ট ফলগুলোর মধ্যে লিচু অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্রই লিচুর আবাদ করা যায়। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম লিচুতে ৬১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৩.৬ গ্রাম শর্করা, ১.১ গ্রাম আমিষ, ১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৭ মিলিগ্রাম লৌহ, ৩১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। পেট ব্যথা, কাশি, টিউমার ও গ্লান্ডের বৃদ্ধি দমনে লিচু বেশ কার্যকরী। বোলতা, বিছা পোকায় কামড়ালে লিচু পাতার রস খেলে উপকার হয়। চর্ম রোগের ব্যথায় লিচুর বীজ বেশ উপকারী। গলার ঘা সারাতে পানিতে সিদ্ধ লিচুর শিকড়, বাকল ও ফুল বিশেষভাবে উপযোগী। লিচু কচি অবস্থায় শিশুদের বসন্ত রোগে, বীজ অম্ল ও স্নায়বিক যন্ত্রণায় ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গলার কষ্ট উপশমের জন্য লিচু গাছের বাকল ও শিকড়ের ক্বাথ গরম পানি সহ কুলি করলে উপকার পাওয়া যায়।

কুলঃ কুল এ দেশের একটি জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর ফল। দেশের সব এলাকাতেই কুলের চাষ করা হয়। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে ১০৪ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২৩.৮ গ্রাম শর্করা, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৫১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। কুল ও এর পাতা বাটা বাত রোগের উপশম করে। হৃদরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বসন্ত রোগ, মেদ কমাতে, মাথা ব্যথা, অর্শ্বরোগসহ পোকার দংশন নিরাময়ে বেশ উপকারী। রক্ত শোধন, রক্ত পরিষ্কার ও হজমীকারক হিসাবে কুলের বেশ ব্যবহার আছে। পেট ফাঁপা, যন্ত্রণা, বায়ুর উদ্রেক, অরুচি, প্রদর রোগে কুলের ফুলের নির্যাস বেশ উপকারী। শুকনো কুলের গুঁড়া ও আখের রস একসাথে মিশিয়ে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। ফোঁড়ায় কুল পাতা বেটে প্রলেপ দিলে এবং অর্শ্ব যন্ত্রণায় কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে সেঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়। জ্বর, ডায়রিয়া, ফোঁড়া ও ক্ষত চিকিৎসায় উপকারী।

নারিকেলঃ নারিকেল বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফল। তৈল হিসাবেও এর ব্যবহার ব্যাপক। কচি নারিকেলের পানি অত্যন্ত সুপেয়। কচি নারিকেলের শাস বেশ মুখরোচক খাবার। পরিপক্ব নারিকেলের শাস নানাভাবে খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম নারিকেলে ৬৬২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৮.৪ গ্রাম শর্করা, ৬.৮ গ্রাম আমিষ, ৬.৬ গ্রাম আঁশ, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৭ মিলিগ্রাম লৌহ বিদ্যমান। ডাবের পানি গ্লুকোজ স্যালাইনের বিকল্প হিসাবে পেটের পীড়া উপশমকারী। ডায়রিয়ার ফলে শরীরে যে পানি ও লবণের ঘাটতি হয় তা পূরণে ডাবের পানি অত্যন্ত উপযোগী। কৃমিনাশক ও পিত্তনাশক হিসাবেও এ পানি বিশেষ উপকারী। নারিকেলের মালা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম/কাই হয় তা দাদ রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়।

আনারসঃ আনারস পুষ্টিকর সুস্বাদু ফল। আনারসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এটি একটি মুখরোচক ফল। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে ৩০ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি, ৬.২ গ্রাম শর্করা, ০.৯ গ্রাম আমিষ, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৮৩০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন পাওয়া যায়। কাঁচা আনারসের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে কৃমি দমন হয়। এছাড়াও কাঁচা আনারস গর্ভপাতকারী ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা আনারসের রস পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক ও পান্ডু রোগ উপশমকারী। আনারস খেলে বল বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কফ, কাশি, উপশমসহ জীবাণুনাশক, হজমকারক, মূত্রবর্ধক ও চর্মরোগ নিবারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জামঃ জাম এ দেশের গ্রামেগঞ্জে এক অতি পরিচিত ফল। টাটকা ফল হিসাবে খাওয়া ছাড়াও এ থেকে উপাদেয় রস, স্কোয়াশসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তৈরী করা যায়। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম জামে ১১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.৪ গ্রাম শর্করা, ১.০ গ্রাম আমিষ, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ৩.৮ গ্রাম আঁশ, ২২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪.৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ৬০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১২০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন পাওয়া যায়। পাকা জামের রস সৈন্ধব লবণের সাথে মিশিয়ে ৩-৪ ঘণ্টা পর খেলে পাতলা পায়খানা, অরুচি ও বমিভাবের উপশম হয়। জামের বীজ থেকে তৈরী পাউডার খেলে বহুমূত্র রোগের নিরাময় হয়। জামের কচি পাতা পেটের রোগের ওষুধ হিসাবে কাজ করে। জাম ও আমের রসের মিশ্রণ পান করলে বহুমূত্র রোগের উপশম হয়।

বেলঃ বেল বাংলাদেশের একটি মৌসুমী ফল। বেলের পুষ্টিমান ও ঔষধিগুণ বেশ ভাল। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম বেলে ৮৭ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৮.৮ গ্রাম শর্করা, ২.৬ গ্রাম আমিষ, ২.৯ গ্রাম আঁশ, ৩৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৬ মিলিগ্রাম লৌহ, ৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর ও আমাশয় নিরাময়ে বেল বেশ উপকারী। আধাপাকা বেল আমাশয় ও ডায়রিয়া নিরাময়ে অধিক কার্যকরী। সর্দি, সর্দি জ্বর, ক্ষুধা বৃদ্ধিসহ পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধিতে বেল উপকারী। বেলের পাতার রস মাথা ঠাণ্ডা রাখতে, জন্ডিস ও শ্বাসকষ্ট রোধে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস সেবনে চোখের ছানি ও জ্বালা পোড়া কমে যায়। বেল পাতা বা বেলের আঁটির ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া, পুঁজ পড়া ও মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

লেবুঃ লেবু সবারই প্রিয়। সালাদ হিসাবে লেবুর ব্যবহার খুব বেশী। সরবত তৈরীতে লেবুর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম লেবুতে ৪৭ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১০ গ্রাম শর্করা, ০.৩ গ্রাম আমিষ, ০.৭ গ্রাম চর্বি, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ৪৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। দাঁতের ব্যথা, মাড়ি ফোলা, রক্তপড়া নিরাময়ে লেবুর ছাল চূর্ণ করে মাজন হিসাবে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। জ্বরে, অরুচিতে লেবুর রস বল বৃদ্ধিকারক। লেবুর রস পান করলে তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান শুকায়। মুখের রুচি বাড়ায় ও পরিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। কৃমিনাশক হিসাবেও লেবুর উপকারিতা রয়েছে।

কামরাঙ্গাঃ কামরাঙ্গা একটি সুস্বাদু ও উপকারী ফল। এটি টকমিষ্টি জাতীয় ফল। টাটকা অবস্থায় খাওয়া ছাড়া নানা রকমের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরী করা যায়। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কামরাঙ্গায় ৫০ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি, ৯.৫ গ্রাম শর্করা, ০.৫ গ্রাম আমিষ, ১ গ্রাম চর্বি, ১ গ্রাম আঁশ, ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ৬১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি পুষ্টিকর ফল। রুচিবর্ধক, ক্ষত নিরাময়কারী, পেট ফাঁপা, বমিভাব বন্ধ করায় বেশ উপকারী। শরীরের দুর্বলতা রোধ, প্রস্রাব পরিষ্কারক হিসাবে এর ভূমিকা রয়েছে। পাতা ও ডগা গুঁড়া করে সেবন করলে জলবসন্ত ও কৃমির উপদ্রব কমে যায় এবং হাড়ভাঙ্গা, রক্তপাত নিবারক, জ্বর ও জন্ডিস নিবারণ করে।

আমলকীঃ বর্তমানকালে আমলকী দেশের সকল অঞ্চলেই কম বেশী দেখা যায়। সব ফলের মধ্যে আমলকীতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ভিটামিন সি বিদ্যমান। ওষুধি ফল হিসাবেই আমলকীর পরিচিতি বেশী। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে ১৯ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৩.৫ গ্রাম শর্করা, ০.৯ গ্রাম আমিষ, ৩.৪ গ্রাম আঁশ, ৩৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.২

মিলিগ্রাম লৌহ, ৪৬৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। ডায়রিয়া, পেটের পীড়া, কাশি, হাঁপানি, বহুমূত্র, অজীর্ণ, জ্বর জ্বর ভাব, যকৃতের রোগ নিরাময়ে আমলকী বিশেষ উপকারী। বলবৃদ্ধিকারক ও আমাশয় রোগের প্রতিষেধক হিসাবে আমলকীর পাতার রস উপকারী। এছাড়াও অজীর্ণ, বদহজম ও চর্ম রোগের চিকিৎসায় আমলকী ব্যবহৃত হয়। আমলকীর রস ও মধু মিশিয়ে খেলে শিশুদের দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়। প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া ও প্রস্রাব বন্ধ রোধে আমলকীর নির্যাস খাওয়া উত্তম। ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত আমলকী টাটকা ও ভিজিয়ে রস খাওয়া উচিত। চুল পড়া, চুলপাকা রোধে আমলকী বেটে মাথায় লাগাতে হবে। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের শক্তি বর্ধক, পিপাসা নিবারক, জন্ডিস, রক্তস্বল্পতা, পেটের প্রদাহ এ ফল রোধ করে।

আমড়াঃ আমড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই সুপরিচিত ও সমাদৃত। তবে বৃহত্তর বরিশাল ও সাতক্ষীরা এলাকায় এর উৎপাদন সর্বাধিক। প্রতি ১০০ গ্রাম আমড়ায় রয়েছে- ভিটামিন সি ৯২ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮০০ মাইক্রোগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ মিলিগ্রাম, আমিষ ১.১ গ্রাম, শর্করা ১৫ গ্রাম, লৌহ ৩.৯ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি এবং জলীয় অংশ ৮৩.২ গ্রাম। আমড়া পিত্ত ও কফ নিবারক, আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিস্কারক। এছাড়া রুচিবর্ধক হিসাবে আমড়া যথেষ্ট উপকারী।

আতা ও শরিফাঃ আতা ও শরিফা বেশ সুস্বাদু ফল। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশী আতা ও শরিফা জন্মে। প্রতি ১০০ গ্রাম আতা ও শরিফায় রয়েছে জলীয় অংশ ৭৬.৭ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯০ কিলোক্যালরি, লৌহ ১.৫ গ্রাম, ভিটামিন সি ৩৮ মিলিগ্রাম। আতা ও শরিফা বলকারক, বাত ও পিত্তনাশক, বমননাশক, রক্ত ও মাংসবৃদ্ধিকারক। এছাড়া আতার শিকড় রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর।

তেঁতুলঃ মহিলাদের প্রিয় ফল তেঁতুল। এটি ভেষজ গুণাবলী সম্পন্ন। তেঁতুলের পুষ্টিমান ভাল। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম তেঁতুলে ৬২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৩.৯ গ্রাম শর্করা, ১.১ গ্রাম আমিষ, ২৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান। রক্তের কোলেস্টেরল কমানো, শরীরের মেদভূড়ি কমাতে তেঁতুল বেশ উপকারী। খাদ্য হজমে তেঁতুলের টারটারিক এসিড বেশ সহায়ক। পেটের অম্লগ্যাস, হাত, পা জ্বালা পোড়া উপশমে তেঁতুলের শরবত বিশেষভাবে উপকারী। মাথা ব্যথা কমাতে তেঁতুল খেলে উপকার হয়। তেঁতুলের শরবত নিয়মিত খেলে প্যারালাইসিস অঙ্গের অনুভূতি ফিরে আসে। কচি পাতা সিদ্ধ করে ঠাণ্ডা অবস্থায় খেলে সর্দি কাশি ভাল হয়। রাতে ঘুমানোর পূর্বে তেঁতুলের শরবত খেয়ে ঘুমালে ঘুম ভাল হয়। শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা হ্রাসে তেঁতুলের শরবত বিশেষ উপকারী।

ফল পুষ্টি ও ভেষজ গুণাবলীর এক উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার। তাই শরীর, স্বাস্থ্য ও মন সতেজ রাখতে নিয়মিত ও পরিমিত বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

[সংকলিত]

কবিতা

সৎকর্ম

- মাহবুবুল হক্ব
বালুবাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

সুন্দর দিন,
এত শীতল, এত শান্ত, এত উজ্জ্বল!
নবদম্পতির মতো আনন্দে উদ্বেলিত
আকাশ পৃথিবীর কি অপূর্ব মেলবন্ধন
উজ্জ্বল কিরণমালা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে বিলীন হয়ে যায়
রাত্রির ঘোর অমানিশায়।
শিশির ঝরা কি দারুণ জ্যোৎস্না রাত
জানি তুমিও শেষ হবে প্রভাতের আঙ্গিনায়।
সুন্দর গোলাপ,
বর্ণে-গন্ধে-রূপে কতনা উজ্জ্বল।
মধুমক্ষিকার ভীড়, সুবাসিত মাতোয়ারা চারিদিক
কিন্তু কতটা সময়?
তোমার রঙ্গীণ পাপড়িগুলো বিবর্ণ হবে, ঝরে পড়বে একে একে
এবং তুমিও অবশ্যই মারা যাবে।
সুন্দর বসন্ত,
গাছে গাছে কচিপাতা বাহারী রূপের ফুলের সমাহার
হিল্লোলিত মাতাল সমীরণ
পাপিয়া কোকিলের সুমধুর কলতান
সময়ের ঘূর্ণিপাকে তুমিও হারিয়ে যাবে।
কেবলমাত্র সৎকর্মই
দিনে দিনে সারকাষ্ঠের মতো হবে আরও সমৃদ্ধ
কখনই যাবে না ধ্বংস হয়ে
জ্বলে পুড়ে সমস্ত পৃথিবী কয়লা হ'লেও
থাকবে তুমি পুণ্যাত্মার পাশে সর্বদা চিরন্তন।

***

খুশীর ঈদ

-আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

খুশীর ঈদে নিজেকে ভুলে
পরকে ভালবাসো,
পরের দুঃখে ভাগী হয়ে
তৃপ্ত মনে হাসো?
ঈদের দিনে মনের মাঝে
সব ভেদাভেদ ভুলো,
পরের জন্য কাজ করতে
নিজকে গড়ে তুলো॥
সবাই মিলে খুশীর ঈদ
কর ভাগাভাগি,
তাহ'লে দুঃখ-ক্লেশ রবে না
আর কারো লাগি॥
ধনী-গরীব সবাই সমান
এই হোক শ্লোগান,
খুশীর ঈদের আনন্দ বিলাতে
কর সবারে আহ্বান॥

***

পর্দা

-ছাবিলা ইয়াসমীন
পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।

আমার সোনা মা বোনেরা
শোন দিয়ে মন,
নারী হয়ে জন্ম মোদের
পর্দা প্রয়োজন।
পর্দা হ'ল দ্বীনের বিধান
পালন করতে হবে তাই
পর্দা ছেড়ে চললে নারীর
কোন মূল্য নাই।
মেয়েরা মায়ের জাতি
কত যে সম্মান,
পর্দা ছেড়ে আজ সে নারী
হচ্ছে অপমান।
পত্রিকার পাতা খুললে
প্রায়ই দেখা যায়,
এসিড নিক্ষেপ নারী ধর্ষণ
এসব খবর রয়।
পর্দা করে চললে নারী
পাবে সবার শ্রদ্ধা
শয়তানের ভূষণ ছেড়ে
কর দ্বীনের পর্দা।

***

বিজয়ের শর্ত

-ডাঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
অতিরিক্ত যেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, দিনাজপুর।

কান পেতে শোন যত মুমিন-মুমিনা
আল্লাহ্‌রই সৃজন আকাশ ও যমীন।
সারাবিশ্বে কায়েম কর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত
দারিদ্র্য অবসানে ধনীদের দিতে হবে যাকাত।
ছিয়ামে তাক্বওয়া হাছিল কর আসলে মাহে রামাযান
অর্থের যোগান হ'লে হজ্জ কর সম্পাদন।
আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে কুরআনে এখন তরতাজা
মুমিনদের জন্য সারা পৃথিবীর খিলাফতের মর্যাদা।
সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে বিশ্বমানবতা
নিপাত যাক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে অবিশ্বাসীদের বর্বরতা।
আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয়; নন তিনি একের অধিক
আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে বান্দা তাঁর সাথে কখনো করবে না শরীক।
বিশ্ব প্রভু করুণার আধার যার অপর নাম রহমান ও রহীম
সফলতায় ভরে দিবেন তিনি দুনিয়ার আকাশ ও যমীন।
আখেরাতে মুক্তি দিবেন মুমিনদেরকে জাহান্নাম হ'তে
সফলকাম মুমিন-মুমিনাদের স্থান দিবেন জান্নাতে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। হামিং বার্ড, দৈর্ঘ্য ২.২৫ ইঞ্চি, ওযন প্রায় ছোট ১টি খামের সমান।
২। হামিং বার্ড। ৩। উট।
৪। উট। মেরু ভল্লুক, এরা মাইনাস ৩০° ডিগ্রী তাপমাত্রায় একটানা ৩০ মাইল সাঁতার কাটতে পারে।
৫। অ্যালবাট্রস।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। মেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে উপরে যেতে বাধা দেয় বলে।
২। মাটির পাত্র পানির বাষ্পীভবনে সাহায্য করে বলে।
৩। বায়ুর চাপ কম থাকার কারণে।
৪। সমুদ্রের পানির ঘনত্ব নদীর পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশী বলে।
৫। আর্দ্রতার অভাবে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)

১। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম কী?
২। জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন কে?
৩। বঙ্গভবনের পূর্ব নাম কী ছিল এবং বঙ্গভবন নাম রাখেন কে?
৪। কোন্ প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত?
৫। কোন্ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়?

** সংগ্রহেঃ হাবীবুর রহমান*
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (জাতীয় মসজিদ)

১। বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের নাম কী?
২। কার প্রস্তাবে জাতীয় মসজিদের নামকরণ করা হয়?
৩। কে কত সালে জাতীয় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন?
৪। বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদকে জাতীয় মসজিদ রূপে ঘোষণা করেন কে?
৫। জাতীয় মসজিদটি মোট কয় তলা বিশিষ্ট এবং এর মূল ভবনটি কয় তলা?

** সংগ্রহেঃ হাবীবুর রহমান*
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

দর্শনপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় দর্শনপাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি রাজশাহী যেলার উপদেষ্টা জনাব আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শরীফুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আব্দুছ ছামাদ। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকাদের দু'টি পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর সিংহমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এমদাদুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি ইসলামী রীতি-নীতি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আল-আমীন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আরীফা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী যেলা সোনামণি পরিচালক জনাব আফাযুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সোনামণি বালক ও বালিকাদের দু'টি পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

হলুদী, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর হলুদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা সোনামণি উপদেষ্টা জনাব আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুবাশ্বেরা খাতুন এবং জাগরণী পরিবেশন করে শাহীদা খাতুন। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুল খালেক। প্রশিক্ষণ শেষে একটি সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

নাছিরাবাদ, ঢাকা ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় নাছিরাবাদ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের ছাত্র জনাব আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আবুল কালাম আযাদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আল-আমীন ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি টিপু সুলতান।

বড়কুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি কাযী আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জাহিদুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল জাববার। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকাদের দু'টি পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

দমদমা, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি জনাব মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বাবুল আহমাদ এবং জাগরণী পরিবেশন করে মেহেদী হাসান। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতীন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকাদের দু'টি পৃথক শাখা গঠন হয়।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পেনশন তুলতে ঘুষ দিতে হয় ৮ হাযার টাকা

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন উত্তোলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম চলছে। ৭১ শতাংশ পেনশনভোগীকেই ঘুষ দিয়ে পেনশন তুলতে হয়। পেনশনভোগীরা গড়ে ঘুষ দেন ৮ হাযার টাকা। যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ হয় আরো প্রায় ৪ হাযার টাকা। অনেকে হয়রানির কারণে পেনশন গ্রহণ থেকেও বিরত থাকেন। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেয়া হয়। গত ২৫ আগষ্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে টিআইবি এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে একই পদ্ধতিতে সব সরকারী কর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ডের একটি কপি তৈরী করা, সহজবোধ্য পেনশন কাজের ব্যবহার, টাস্কফোর্স গঠন ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জবাবদিহিতার অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সরকারী চাকরিজীবীর কাছে পেনশন প্রাপ্তি এখন দুরূহ। পেনশন গ্রহণের সময় আবেদনকারীকে ছুটি প্রাপ্যতার সনদ, এলপিআর আবেদন, ভবিষ্যৎ তহবিল চেক, চাকরির বিবরণ বহি, শেষ বেতনপত্র, নাদাবি সনদ, বাড়ী ভাড়া কর্তনের বিবরণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধের সনদ, পেনশন পরিশোধ আদেশ ইত্যাদি ৮ থেকে ১১ ধরনের কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে দিতে হয় ১৩ থেকে ১৬ ধরনের কাগজ। ঘুষ প্রদান সত্ত্বেও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গড়ে সময় লাগে ১৫৯ দিন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পেনশন প্রক্রিয়াকরণে ছুটি প্রাপ্যতার সনদ (এলএসি) স্বল্প সময়ে পেতে ঘুষের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে ২শ' থেকে ১ হাযার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে সরকারী চাকরিজীবীর সংখ্যা ৯ লাখ ৩২ হাযার ৫০ জন। তখন পেনশন ভোগকারী ছিল ৩ লাখ ২৪ হাযার ১০৭ জন। তবে বর্তমানে এ সংখ্যা কত তা জানতে পারেনি টিআইবি। সরকারের কাছেও এর সঠিক সংখ্যা নেই বলে জানানো হয়।

ধৈঞ্চা থেকে উৎকৃষ্ট সুতা আবিষ্কার

সুদীর্ঘকাল ধরে ধৈঞ্চা কেবল গ্রামবাংলায় জ্বালানি ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। বহুল পরিচিত গ্রামবাংলার এই উদ্ভিদের কোন অর্থনৈতিক মূল্য ছিল না। মুজীবুল হক নামের এক গার্মেন্ট ব্যবসায়ী প্রথম ধৈঞ্চার আঁশ থেকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের সুতা আবিষ্কার করেছেন। এ সুতা পাটের সুতার চেয়েও মজবুত ও টেকসই। তার আবিস্কৃত এ সুতা দিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাগ, চট, বস্তা, গালিচা তৈরী ছাড়াও নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বিদেশে রফতানী করেও বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব। জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মুজীবুল হক এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, পাটের আঁশ খুব হাল্কা। কিন্তু ধৈঞ্চার আঁশ পাটের আঁশের চেয়ে অনেক গুণ শক্ত। প্রথমে তিনি ধৈঞ্চার আঁশ থেকে সুতা তৈরী করেন। কিন্তু সেটি তেমন মজবুত হয়নি। ফলে তিনি কৌশল পরিবর্তন করেন। অর্ধেক পাট ও অর্ধেক ধৈঞ্চার আঁশ প্রক্রিয়াজাত করে দেখতে পান সেটি পাটের সুতার চেয়েও অনেক মজবুত হয়েছে। তারপর তিনি উৎপাদিত এ সুতা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের চিন্তা করেন। এ ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, চীনের দু'টি কোম্পানী মুজীবুল হককে ধৈঞ্চার আঁশের নমুনা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গত ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে। রাজধানীর হেয়ার রোডের ছায়াবীথি-৪ কলতানে কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০০৭, ধারা ৩(১)-এর বিধান অনুযায়ী ঐ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এটি করা হয়েছে বলে আইন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে, যাদের মধ্যে একজন সুপ্রিমকোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হবেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন। রাষ্ট্রপতি বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করবেন। তবে ৫০ বছরের কম এবং ৭২ বছরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা, জেল বা সংশোধন, হেফাযত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাশিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া, মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধাস্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিবিধ বিষয় পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা, মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হ'তে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা প্রভৃতি। তবে আদালতে বিচারাধীন মামলার কোন বিষয়, ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০-এর অধীন ন্যায়পাল কর্তৃক বিবেচ্য কোন বিষয়, এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট-১৯৮০ এর অধীনে স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিষয় কমিশনের কার্যাবলী বা দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দেশে পথকলি শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৫ হাযার

বাংলাদেশে ৫ বছরের নীচে দেড় কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। তারা তিন বেলা খেতে পায় না। তাদের যত্ন নেওয়ার ও প্রটেকশন দেয়ার কেউ নেই। লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থাও অপ্রতুল। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি

হাযারে ৪৫ জন। ৪০ ভাগ শিশুর ওযন বয়সের তুলনায় কম। ৪৯ ভাগ শিশু রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশে শুধু পথকলি শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৫ হাযার ২২৬ জন এবং ঢাকাতেই ৩ লাখ ৩৮ হাযার ৮০৭ জন। গত ৩১ আগষ্ট ময়মনসিংহের ফুলপুর উপযেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি বাংলাদেশ এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ফুলপুর এডিপির উদ্যোগে 'আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের মুক্তির লক্ষ্যে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা হয়।

দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে ৪০ লাখ মানুষ

-বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক বলেছে, খাদ্যপণ্যের দাম ৩ শতাংশ বাড়ার ফলে বাংলাদেশের ৪০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে গেছে। গত ৩ বছরে দারিদ্র্য নিরসনের হার ৫ শতাংশের স্থলে ২ শতাংশ হারে কমেছে। দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। গত ২৬ আগষ্ট বিশ্বব্যাংকের কার্যালয়ে অর্থনৈতিক প্রতিবেদকদের নিয়ে 'বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের প্রভাব' শীর্ষক এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। কর্মশালায় আরো জানানো হয়, ৬ শতাংশের উপর জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় ২০০৫ সালের পর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার ৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বাড়ার কারণে দরিদ্রের হার কমেছে ৩ শতাংশ। ২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে দাঁড়িয়েছে।

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি

দেশের সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি বিএম/ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল গত ১০ সেপ্টেম্বর একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সার্বিক পাসের হারও অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতি চারজনে তিনজনই উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার সকল বোর্ডের অধীনে অংশগ্রহণকৃত ৬ লাখ ১২ হাযার ৩৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪ লাখ ৬৬ হাযার ৫৭০ জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ১৯ ভাগ। গত বছর এ পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬০ ভাগ। অর্থাৎ এ বছর পাসের হার বেড়েছে ১০ দশমিক ৫৯ ভাগ। এ বছর ৯ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাযার ৪৫ জন। গত বছর জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ছিল ১১ হাযার ১৪০ জন। পাসের হারের বিবেচনায় গত বছরের ন্যায় এবারও ৯ বোর্ডে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। এবার এ বোর্ডের পাসের হার ৮২ দশমিক ৪৩ ভাগ। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার ৪ লাখ ৯৬ হাযার ১৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৭১ হাযার ৩৮২ জন। পাসের শতকরা হার ৭৪ দশমিক ৮৫ ভাগ। গত বছরের তুলনায় এবার ৭ বোর্ডে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ দশমিক ৫৮ ভাগ। পাসের হারের দিক থেকে ৭ বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ড শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এ বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৮২ দশমিক ৩১ ভাগ।

আলিমঃ ২০০৮ সালের আলিম পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮২.৪৩। ২০০৭ সালের পরীক্ষার ফলাফলের চাইতে এবারের গড় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.১২ ভাগ। এবারের আলিম পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ পেয়েছে ২,৮৮৬ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ২,৩৩৩ জন এবং ছাত্রী ৫৫৩ জন। এছাড়া জিপি ৪ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১ হাযার ৯৩৭ জন। আলিম পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬১,৭২৪ জন, মোট পাস করেছে ৫০ হাযার ৮৮২ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ৩২ হাযার ৭৩৬ জন এবং ছাত্রী ১৮ হাযার ১৪৬ জন। ছেলেদের গড় পাসের হার ৮৩.৩২% এবং মেয়েদের গড় পাসের হার ৮০.৮৮%।

ভোকেশনালঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার গড় পাসের হার ৮১.২৭%। এ পাসের হার অর্জনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে ৯ বোর্ডের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৭ হাযার ৪৩০ জন, পাস করেছে ৪৫ হাযার ৭৩৮ জন। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের পাসের হার ৮১.২৭%, ডিপ্লোমা ইন কমার্সের পাসের হার ৭৮.০৫% এবং ভোকেশনাল পরীক্ষার পাসের হার ৪৩.২৩%।

ফাযিল ও কামিলঃ এবার ফাযিল পরীক্ষার গড় পাসের হার ৮০.৯৮%। গত বছর ছিল ৭৮.৩৬%। কামিল পরীক্ষার গড় পাসের হার ৯৭.৭৩%, গত বছর ছিল ৯৭.৩৭%। ফাযিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩ হাযার ৪৫৯ জন, তন্মধ্যে ছাত্র ২ হাযার ৭৫০ জন এবং ছাত্রী ৭০৮ জন। প্রথম বিভাগে পাস করেছে ১ হাযার ৪৫৬ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ১ হাযার ২২৭ জন এবং ছাত্রী ২২৯ জন। কামিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭০৬ জন, তন্মধ্যে ছাত্র ছিল ৫৫০ জন এবং ছাত্রী ছিল ১৫৬ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে মোট ৪০০ জন, তন্মধ্যে ছাত্র ৩৩৬ জন এবং ছাত্রী ৬৪ জন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ১১০তম

বিশ্বব্যাংকের 'ডুয়িং বিজনেস' র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের ক্রমাবনিতর ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছরের ডুয়িং বিজনেস বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ আরো ছয় ধাপ নীচে নেমে গেছে। গত বছর সার্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৪তম। এবার ১১০তম অবস্থানে চলে গেছে বাংলাদেশ। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে অবস্থান ছিল ৮৮তম এবং ২০০৫ সালে ছিল ৮১তম। টানা গত পাঁচ বছর ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সূচকে ক্রমাবনিতর মাধ্যমে ব্যবসা ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে চরম নেতিবাচক অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে সামান্য আশার কথা হচ্ছে, এ বছর ডুয়িং বিজনেসের ১০টি ভিত্তির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে বাংলাদেশ বেশ ভাল করেছে। বিশেষ করে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় আগের থেকে অনেক কমে গেছে এ বছরের রিপোর্ট অনুসারে। গত ১০ সেপ্টেম্বর সারাবিশ্বে একযোগে বিশ্বব্যাংক ডুয়িং বিজনেস সূচকটি প্রকাশ করে। ভাল ব্যবসায় সহায়ক পরিবেশ নির্দেশ করে এমন ১০টি সূচকের ভিত্তিতে ১৮১টি দেশের মধ্যে পরিচালিত জরিপ অনুসারে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। প্রায় সাড়ে ৬ হাযারের বেশী বিজনেস কনসালটেন্ট, আইনজীবী, একাউন্টেন্ট ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুসারে টানা তৃতীয়বারের মতো শীর্ষে অবস্থান করছে সিঙ্গাপুর, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। আর সবচেয়ে নীচের অবস্থানে অর্থাৎ ১৮১তম স্থানে রয়েছে কঙ্গো।

Contents

বিদেশ

বিশ্বের প্রথম সৌরবিদ্যুৎচালিত জাহাজ

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটে যখন দেশে দেশে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান চলছে, তখন প্রযুক্তিতে অগ্রসর জাপান সৌরবিদ্যুৎচালিত মালবাহী জাহাজ তৈরী করেছে। বিশ্বে এ ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ এটাই প্রথম। এ বছরের শেষ দিকে এ জাহাজ সাগরে ভাসানো হবে। জাহাজটিতে ৩২৯টি সোলার প্যানেল সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৩ লাখ ৭০ হাযার মার্কিন ডলার। টোকিও মোটর কোম্পানির মালামাল পরিবহনে জাহাজটি ব্যবহার করা হবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিপ্পন ইউসেন এটাকে একটি পরীক্ষামূলক নির্মাণ বলে অভিহিত করে বলেছে, তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে আরো শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক জাহাজ তৈরী করা। অবশ্য সমালোচকরা এটাকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছে যে, সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে ভেজা ও আর্দ্রতা বেশী থাকে বলে সৌরবিদ্যুৎচালিত জাহাজ সহজেই দুর্ঘটনাকবলিত হ'তে পারে। অবশ্য নির্মাতা কোম্পানির দাবী, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই এ জাহাজ তৈরী করা হয়েছে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল সাংহাইয়ে

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আকাশচুম্বী টাওয়ার ভবন নির্মাণের যেন একটি অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে এ ধরনের স্কাইস্ক্রাপার নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। আকাশচুম্বী টুইন টাওয়ার রয়েছে মালয়েশিয়াতেও। গত ৩১ আগষ্ট চীনের শিল্পনগরী হিসাবে পরিচিত সাংহাইয়ে এমনই একটি টাওয়ার ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল সেন্টার নামের এ ভবনটি সমগ্র চীনে সর্বোচ্চ টাওয়ার ভবন হিসাবে খ্যাত, যার উচ্চতা ৪৯২ মিটার (১,৬১৪ ফুট)। টাওয়ার ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার এবং নির্মাণ কাজে মোট সময় লেগেছে ১৪ বছর। এই সুউচ্চ ভবনের ৭৯ তলা থেকে ৯৩ তলা পর্যন্ত রয়েছে হোটেল। এই হোটেলটিকে বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাজা ভূমিবল

থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল আদুলাদেজ এখন বিশ্বের সবচেয়ে 'ধনী রাজা'। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ তিন হাযার ৫০০ কোটি ডলার। ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজী হাসান আল-বলখিয়াকে পেছনে ফেলে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনের ১৫ জন ধনী রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকায় সবার উঁচুতে নিজের অবস্থান করে নিয়েছেন থাইল্যান্ডের এই রাজা।

ফোর্বস জানায়, ৮০ বছর বয়সী রাজা ভূমিবলের সম্পত্তির পরিমাণ গত বছরই সাত গুণ বেড়ে যায়। ঐ সময় তাঁর সম্পত্তির হিসাব স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা হয়। তাঁর ব্যাংককে তিন হাযার একর সম্পত্তি, ব্যাংকে নগদ অর্থ এবং সিয়াম সিমেন্ট কোম্পানীতে বড় শেয়ার রয়েছে। ভূমিবল তাঁর বিপুল অর্থ দিয়ে থাইল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের তিন হাযার উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছেন। থাইল্যান্ডে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী।

পশ্চিমবঙ্গে ৮৫ শতাংশ মুসলমানের দিনে ২০ রূপী খরচ করার সঙ্গতি নেই

বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার জানান, কোলকাতায় ৮৫ শতাংশ মুসলিমের দিনে মাথাপিছু ২০ রূপী খরচ করার সঙ্গতি নেই। অন্যদিকে ৫ শতাংশ মুসলিম প্রতিদিন ১০০ রূপীও খরচ করতে পারেন। এই বৈষম্য দূর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই নেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন সাচার। উল্লেখ্য, এই বিচারপতির নেতৃত্বেই গঠিত 'সাচার কমিশন' রিপোর্টে ভারতে মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়।

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক ব্যয় ৫ হাযার কোটি টাকা

আমেরিকা ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটির এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, অযৌক্তিক যুদ্ধে ইরাকে দৈনিক ৭২০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫০৪০ কোটি টাকা ব্যয় করছে বুশ প্রশাসন। এটা যদি করা না হ'ত তাহ'লে আমেরিকার ৪২৩৫২৯ জন শিশুর স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত হ'ত। অথবা আমেরিকার ইউনিভার্সিটির ৩৪৯০৪ জন ছেলে-মেয়ের ৪ বছরের গ্রাজুয়েশন কোর্স সম্পন্ন করার স্কলারশিপ দেয়া যেত। ঐ অর্থে ১১৫৩৮৪৬ জন শিশুকে স্কুলের লাঞ্চ দেয়া যেত। একদিনের যুদ্ধ ব্যয়ের খরচ দিয়ে ৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা যেত। অথবা ১২৭৪৩৩৬টি বাড়ী নির্মাণ করা যেত নবায়নকৃত বিদ্যুৎ সুবিধাসহ অথবা ৬৪৮২টি বাড়ী তৈরী করা যেত গৃহহারাদের পুনর্বাসনের জন্য।

ইরানে হামলা চালাতে জর্জিয়ার বিমানক্ষেত্র ব্যবহারের চুক্তি করেছে ইসরাঈল

ইরানের পারমাণবিক ক্ষেত্রসমূহে আগাম হামলা চালানোর জন্য জর্জিয়া তার দু'টি সামরিক বিমানক্ষেত্র ইসরাঈলকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। দক্ষিণ ওসেটিয়ায় গত আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে জর্জিয়া অভিযান চালানোর পর রাশিয়ার বিশেষ বাহিনী ঐ এলাকায় অভিযান চালানোর পর ইউনাইডে প্রেস ইন্টারন্যাশনাল জর্জিয়া-ইসরাঈল চুক্তি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তথ্য মতে, জর্জিয়ার ঐ দু'টি বিমানক্ষেত্র ব্যবহার করে ইসরাঈল দক্ষিণ রাশিয়ায় এবং ইরানে গোয়েন্দা বিমান পরিচালনা করেছে। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, ইরানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ আগাম হামলা চালানোর জন্য ইসরাঈলী বোমারু বিমানকে দক্ষিণ জর্জিয়ার দু'টি সামরিক বিমানক্ষেত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে জর্জিয়া ও ইসরাঈলের মধ্যে গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ঘূর্ণিঝড় আইকে লণ্ডভণ্ড টেক্সাস

ঘূর্ণিঝড় আইকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে আঘাত হেনেছে। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা এই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তিন দিন ধরে। ১২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ঝোড়ো হাওয়াসহ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগর হিউস্টন থেকে লক্ষাধিক লোককে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং লুটপাট রোধে সেখানে কারফিউ জারী করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলে প্রায় ৬০০ মাইল ব্যাপ্তি নিয়ে ধেয়ে আসে হারিকেন বা

ঘূর্ণিঝড় আইকে। মার্কিন আবহাওয়া দফতর আইকেকে দ্বিতীয় মাত্রার বিপজ্জনক ঝড় হিসাবে প্রথমে পূর্বাভাস দিয়েছিল। এখন আইকেকে তৃতীয় মাত্রার মনে করা হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়ে গ্যালভেস্টন নগরসহ বিস্তীর্ণ জনপদে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রায় ১১ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে গেলভেস্টন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে লুইজিয়ানাসহ সীমান্তের নগরগুলোতে তিন লাখের বেশী লোক বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১১-টায় আইকের অবস্থান ছিল গ্যালভেস্টন নগর থেকে ৫৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। ১১০ মাইল বেগের দমকা হাওয়াসহ ঘূর্ণিঝড়টি ঘণ্টায় ১২ মাইল গতিতে জনপদের দিকে এগিয়ে আসে। শনিবার আইকে হিউস্টন নগরে সরাসরি আঘাত হানে। এতে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হয়েছে। এর মধ্যে ৫ সহস্রাধিক বাংলাদেশী রয়েছেন। নিহত হয়েছে ৩০ জন। এ ঘূর্ণিঝড়ে হিউস্টন ও গ্যালভেস্টন শহর দু'টি খাদ্যহীন, বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কার্যত গোটা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেকে বৃষ্টির পানি পান করেছেন। অনেকের বাড়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ছাদ উড়ে গেছে। আবার কারো বাড়ীর চিহ্ন নেই। কারো কারো বাড়ী বা গাড়ী চাপা পড়েছে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ায়।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম তেল শোধনাগারটি হিউস্টনের উপকণ্ঠেই অবস্থিত। আইকে হিউস্টনে আঘাত হানায় পুরো যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের দাম বেড়ে যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পেট্রোলের দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে প্রতি গ্যালন পাঁচ ডলার করে।

ভারতে ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

ভারত গত ১৩ সেপ্টেম্বর আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য হাতে তৈরী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ২শ' কিলোমিটার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চণ্ডিপুরে এ পরীক্ষা চালানো হয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, বিমানবাহিনীর জন্য তৈরী 'অস্ত্র' নামের ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৫ কিলোগ্রাম ওযনের যুদ্ধবোমা বহন এবং রাডারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ৮০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

নয়াদিল্লীতে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ

ভারতে সিরিজ বোমা হামলা হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানী নয়াদিল্লীর ৩টি পৃথক জনবহুল স্থানে বিকট শব্দে পরপর ৫ দফা বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কমপক্ষে ২৫ জন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয়েছে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে কারলবাগের বিখ্যাত গাফফার মার্কেটে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। এর ৪৫ মিনিটের মধ্যে বাকী বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয় কনট প্লেসে এবং বাকীটা গ্রেটার কৈলাসে। গাফফার মার্কেট এলাকার লোকজন জানায়, একটি সিএনজি অটোরিকশায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে মাত্র ১০ সেকেন্ডের ব্যবধানে দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়। বোমা দু'টি ডাস্টবিনে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। আরেকটি বোমা বিস্ফোরিত হয় কনট প্লেসের বড়খাম্বা রোডের মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ পথে। এ বোমাটিও ডাস্টবিনে পেতে রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকটি গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি মুজাহিদ গ্রুপ তাৎক্ষণিকভাবে এ বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়িত্ব স্বীকার করেছে। বোমাগুলো বিস্ফোরিত হবার আগে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন' নামের একটি গ্রুপের পক্ষ থেকে ভারতের কয়েকটি টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রেরিত ই-মেইল বার্তায় হামলার ইঙ্গিতবাহী হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। এর আগে কয়েকটি বোমা হামলার দায়িত্বও এই গ্রুপটি স্বীকার করেছিল বলে জানানো হয়েছে। এ হামলায় সন্দেহ ভাজন ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতীয় টেলিভিশনের খবরে জানানো হয়, ঐ দিন রাজধানী নয়াদিল্লীর ৩টি ব্যস্ততম বাজার এলাকায় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ৫টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকটি যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এবারের বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বোমাগুলো প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হ'লেও সেগুলো খুব বেশী শক্তিশালী ছিল না বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা। এর আগে ২০০৫ সালে নয়াদিল্লীতে বিস্ফোরিত বোমায় ৬৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। তারও আগে ২০০১ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবন চত্বরে যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটানো হয় তাতে নিহত হয় ১৪ জন। একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০০৫ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং আরো কয়েকটি নগরীতে বোমা হামলার ঘটনায় ৪ শতাধিক লোক প্রাণ হারায়।

পৃথিবীর উচ্চতম সেতু

দক্ষিণ ফ্রান্সের মিলাও ভিয়াডাক্ট নামের সেতুটি পৃথিবীর উচ্চতম সেতু। এ সেতুটি ট্যার্ন নদীর ওপর দিয়ে গিয়ে দু'টি উপত্যকাকে যুক্ত করার মাধ্যমে ফ্রান্সের প্যারিস ও স্পেনের বার্সেলোনার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আড়াই কিলোমিটারের এ সেতুটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ৮০৩ ফুট। আর এর স্তম্ভগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ মাস্তুল। এক হাযার ১৩০ ফুট উচ্চতার এ স্তম্ভগুলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্তম্ভও। এর উচ্চতা ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও বেশী। শুধু সেতু বলে নয়, স্থাপত্যবিদ্যা ও প্রকৌশলেও এটি এখন পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। প্রতিদিন হাযারো পর্যটকের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা স্থপতি ও প্রকৌশলীরা ভিড় জমান এই সেতুর বিস্ময়কর নকশা দেখতে। সেতুটির নকশা ও প্রকৌশলের মূলে ছিলেন ফ্রান্সের প্রকৌশলী ভিরলোগিয়াস এবং যুক্তরাজ্যের স্থপতি নরম্যান ফস্টার।

ইউরোপের সবচেয়ে বড় বায়ুখামার

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল রোধ করতে চাচ্ছে। এজন্য তারা ইউরোপীয় দেশগুলোয় বায়ুখামারের মতো বিকল্প শক্তির উৎস তৈরীতে উৎসাহিত করছে। চেক রিপাবলিকের একটি বিদ্যুৎ কোম্পানী সিইজেড ১১০ কোটি ইউরোর একটি বায়ুখামার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটাই হবে ইউরোপের স্থলভাগে সবচেয়ে বড় বায়ুখামার। রোমানিয়ায় এ খামারটি গড়ে তোলা হবে, যা থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। খামারটি ২০০৯ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারবে।

মুসলিম জাহান

জারদারী পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'র (পিপিপি) প্রধান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলী জারদারী বিপুলসংখ্যক ভোট পেয়ে পাকিস্তানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর একযোগে পার্লামেন্টের দুই কক্ষ ও চারটি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সকাল ১০-টার পর ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং বিকাল ৩-টায় শেষ হয়। মোট ৬৮৫ কাস্ট ভোটের মধ্যে জারদারী পান ৪৮৮ ভোট। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়াজ শরীফের দল পিএমএল-এন'র সাইয়েদুযযামান ছিদ্দীক পেয়েছেন ১৫৩ ভোট এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশাররফের দল পিএমএন-কিউ'র প্রার্থী মোশাহিদ হোসেন পেয়েছেন মাত্র ৪৪ ভোট। প্রধান বিরোধী দল নওয়াজ শরীফের 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এন' জারদারির বিজয় মেনে নিয়ে আশা প্রকাশ করেছে, জারদারী একজন নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিজয়ের পর পাকিস্তান টেলিভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জারদারী বলেন, আমার এই বিজয় জনগণের বিজয়, গণতন্ত্রের বিজয়।

জারদারির এই বিজয়কে বিশ্লেষকরা বেনজির ভুট্টোর বিজয় বলেই মনে করছেন। আসলে বেনজির ভুট্টোর ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই জারদারির বিজয় সম্ভব হয়েছে। ভুট্টো ছাড়া জারদারির কোন রাজনৈতিক পটভূমিই নেই। বেনজিরের দুই মেয়াদের শাসনকালে তিনি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি 'মিঃ টেন পার্সেন্ট' হিসাবে কুখ্যাতি পান। দুর্নীতির দায়ে তিনি দীর্ঘ ১১ বছর কারাবরণও করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর জারদারী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি রাজধানী ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জারদারীকে দেশটির ১৪তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান।

পাকিস্তানে মার্কিন কমান্ডো হামলা

পাকিস্তান সরকারের অনুমতি ছাড়াই সেদেশে সামরিক অভিযান চালানোর গোপন নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। গত জুলাই মাসে তিনি এই নির্দেশ দিলেও এতদিন তা গোপন রাখা হয়। তবে গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে হামলার সপ্তম বার্ষিকীতে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা তার এই নির্দেশের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধাদের তৎপরতা বন্ধে পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ করে বুশ এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হন বলে পত্রিকাটি জানিয়েছে। তবে ইসলামাবাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের খবরের কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

জুলাই মাসে ঐ পত্রিকাটিতে এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় যে, পাকিস্তানের ভেতরে আল-কায়েদা ও তালেবানের অসংখ্য গোপন ঘাঁটি রয়েছে এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীও এই তথ্য জানে। এরপর বুশ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়েও এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তান একটি অন্যতম শরীকে পরিণত হয়। গত সাত বছরে এজন্য যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কমপক্ষে এক হাযার কোটি মার্কিন ডলার প্রদান করেছে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ।

বুশের এই গোপন নির্দেশ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি বলে মনে করা হচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আশফাক কায়ানী বুশের এই ধরনের নির্দেশের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, যে কোন মূল্যে পাকিস্তান তার ভূখণ্ড রক্ষা করবে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, যে কোন উপায়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে এবং কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাইরের দেশের সৈন্যদের অভিযান চালাতে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সীমান্তে অভিযান চালানোর জন্য অনুমতি প্রদান করা সংক্রান্ত কোন চুক্তি বা সমঝোতা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হয়নি।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, পাকিস্তান গত ১৩ সেপ্টেম্বর আফগান সীমান্তবর্তী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপজাতীয় এলাকায় জঙ্গী বিমান পাঠিয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান বিমান বাহিনী সেখানে তাদের যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে।

এদিকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রধান শহর মিরানশায়ে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বেসামরিক নাগরিকসহ ২১ জন নিহত হয়েছে। আকাশ থেকে স্থলে ক্ষেপণযোগ্য দু'টি মিসাইল দু'টি ভবনে নিক্ষেপ করা হ'লে এ ঘটনা ঘটে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করবে জিহ্বা!

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া টেকের গবেষকেরা মনে করেন, একটি চুম্বকীয় জিহ্বাচালিত সিস্টেম প্রতিবন্ধী মানুষের মুখকে একটি ভার্চুয়াল কম্পিউটার, দাঁতগুলোকে কিবোর্ড ও জিহ্বাকে এগুলো চালানোর হাতিয়ার হিসাবে রূপান্তর করতে পারবে। গবেষকরা জিহ্বাকে 'জয়স্টিক' হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের হুইল চেয়ার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। জর্জিয়া টেকের গবেষকেরা জিহ্বার ডগায় তিন মিলিমিটার প্রশস্ত একটি চুম্বক বসানোর কথা ভাবছেন। জিহ্বার নড়াচড়ার সঙ্গে চুম্বকের নড়াচড়া গালের ভেতর দুই পাশে বসানো দুটো সেন্সরে ধরা পড়বে। এগুলো একটি রিসিভারে পৌঁছার পর তা একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্দেশনা দিবে। এভাবে নির্দিষ্টভাবে জিহ্বা নেড়ে হুইল চেয়ার বা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, জিহ্বা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে এক ডজনের বেশী আদেশ দেওয়া যাবে। তখন হয়ত চলচ্ছক্তিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জিহ্বা বাঁয়ে-উপরে নিয়ে বাতি জ্বালানো-নেভানো বা জিহ্বা ডানে-নীচে নিয়ে টিভি চালানো বা বন্ধ করার কাজটি করতে পারবে।

ক্ষুধা বিলম্বিত করতে খাদ্যের নতুন রেসিপি

বিশ্বের অনেক দেশ এখন উচ্চ খাদ্যমূল্যের কারণে সঙ্কটে পতিত। আবার অনেক দেশে খাদ্য সঙ্কটে অনেক মানুষ মারাও যাচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে খাদ্য সমস্যার সমাধানে ক্ষুধা বিলম্বিত করতে নতুন এক রেসিপি আবিষ্কার করেছেন উত্তর কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা। ভুট্টা ও সয়াবিনের সমন্বয়ে তৈরী নতুন এক ধরনের নুডুলস আবিষ্কার করেছেন তারা। বিদেশী খাদ্য সহায়তার উপর নির্ভরশীল উত্তর কোরিয়া। দেশটির সরকার খাদ্য সমস্যা মোকাবেলায় বিকল্প উপায় খুঁজতে থাকেন। পেয়েও যান তারা। প্রচলিত নুডুলসকে মানোন্নয়ন করে আবিষ্কার করেন এই নুডুলস। বিজ্ঞানীদের দাবী, এই নুডুলস প্রচলিত নুডুলসের তুলনায় দ্বিগুণ প্রোটিনসমৃদ্ধ ও পাঁচগুণ ফ্যাটসমৃদ্ধ হবে। এতে করে ক্ষুধাও লাগবে বিলম্বে। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হবে কম।

মানুষের পেশাব উন্নতমানের সার!

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের পেশাব নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদানের বড় উৎস হ'তে পারে। আর তাই এটি ব্যবহার করা যেতে পারে কৃষি জমিতে সার হিসাবে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই মানবমূত্র ব্যবহার করে বাঁধাকপির বাম্পার ফলন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা বলছেন, ফ্রি এই সার ব্যবহারের ধারণাটি মন্দ হবে না। ফিনল্যান্ডের কুপিওস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাদলের নেতা হেলভি হেইথোলেন টানস্কি বলেছেন, যদি সঠিক নিয়মে ও যথাযথভাবে মানবমূত্র জমিতে প্রয়োগ করা যায় তাহ'লে এটি পরিবেশ দূষণ করবে না; বরং সম্পদে পরিণত হবে। এতে দরিদ্র মানুষ অধিক ফলন পাবে, কিন্তু অর্থ ব্যয় হবে না সার কেনা খাতে। গবেষকরা বলছেন, একজন ব্যক্তি সারা বছর যে পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করে তা ১৫০টি বাঁধাকপি উৎপাদনে সারের কাজের জন্য যথেষ্ট। বাণিজ্যিক সার ব্যবহার করে একটি জমিতে যে পরিমাণ বাঁধা কপি উৎপাদন করা যায়, মূত্র ব্যবহার করে সেই একই জমিতে ৬৪ কিলোগ্রাম বা ১৪১ পাউন্ড বেশী বাঁধাকপি উৎপাদন সম্ভব। তবে মানবমূত্র কীভাবে ব্যবহার করলে কৃষক উপকার পাবে এবং এ কাজটি করতে পানি সাশ্রয় হবে ও পানিসম্পদ দূষিত হবে না, সেটি নিয়ে এখন তারা কাজ করছেন।

জ্বালানি তেলে চলবে মোবাইল ফোন

জাপানের বৃহত্তম মোবাইল কোম্পানী এলটিটি ডোকমো তৈরী করেছে এমন মোবাইল চার্জার যা কি-না জ্বালানি তেলে চালানো যাবে। এই পলিমার ইলেক্ট্রোটাইট ফুয়েল সেল (পিইএফসি) শুধু মোবাইল সেটের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিকে চার্জ করে না; সেই সাথে ব্যাটারিটির স্থায়িত্ব তিন গুণের কাছাকাছি বৃদ্ধিও করে। ২৪×২৪×৭০ মিলিমিটারের এই ফুয়েল সেলটির ওযন মাত্র ৪৫ গ্রাম। এর প্রস্তুতকারকরা আশা করছে, ২০০৯ সাল নাগাদ এটি বাজারে আসতে পারে।

দূষিত মাটি সাফ করতে কেঁচো

মাটিকে উর্বর করার ক্ষেত্রে কেঁচোর ভূমিকার কথা কম-বেশী আমরা সবাই জানি। সম্প্রতি দূষিত মাটি থেকে ধাতব উপাদান শোধন করে মাটি পরিষ্কার রাখতে কেঁচোদের অসাধারণ ভূমিকার কথা জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা। অনেক এলাকার মাটি খনি, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির কারণে দূষিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ক্ষতিকর ধাতব উপাদান মাটিতে মিশে মাটিকে ক্ষারযুক্ত ও অনুর্বর করে ফেলে। এক কথায় এসব এলাকার মাটি মরে যায়। এসব মরা মাটিতে কোন চাষবাস করা যায় না বা গাছপালা জন্মায় না। কিন্তু এ ধরনের মাটিতে কেঁচো থাকলে সেই মাটি ধীরে ধীরে উর্বর হয়ে ওঠে। ফলে ঐ এলাকায় গাছপালা জন্মানো সম্ভব হয়। কেঁচোরা এমনকি বিষাক্ত শীলা, দস্তা, তামা এবং আর্সেনিক উপাদানও খেয়ে হজম করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কেঁচোর বিষাক্ত উপাদান সহ্য করার পেছনে রয়েছে এক ধরনের প্রোটিন। কেঁচোর অভ্যন্তরে নিঃসরিত এই প্রোটিন ধাতব উপাদানকে হজম করতে সাহায্য করে। তাই কেঁচোকে 'মৃত্তিকা গোয়েন্দা' বা সয়েল ডিটেকটিভ হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

বিদ্যুতে চলবে পেট্রোলের গাড়ী

জাপানের খ্যাতনামা গাড়ী নির্মাতা কোম্পানী টয়োটা ব্রিটেনের বাজারে ছেড়েছে পেট্রোল-ইলেকট্রিক হাইব্রিড গাড়ী। ফলে গাড়ির মালিকেরা গাড়ী চালানোর জন্য পেট্রোল পাম্প অথবা ইলেকট্রিক সকেটের যেকোনটি যেকোন সময় বেছে নিতে পারবেন। এ গাড়ির মালিকেরা শহরে চলাচলের জন্য সপ্তাহের পাঁচ দিন বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করতে পারবেন। আর সপ্তাহের ছুটিতে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সময় জ্বালানি হিসাবে তারা ব্যবহার করবেন পেট্রোল। টয়োটার নতুন এই হাইব্রিড গাড়ী পরিবেশবান্ধবও বটে। প্রচলিত পেট্রোলচালিত গাড়ির চেয়ে এটি ৪০ শতাংশ কম কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের মুক্তি সম্পর্কিত অবশিষ্ট খবর

জনমানুষের প্রতিক্রিয়াঃ

'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপসৃয়মান'। মহান আল্লাহ্র এই বাণীই অভ্রান্ত ও চিরন্তন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কুচক্রীদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে মহান আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে সাড়ে তিন বছরের বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। গত ২৮ আগষ্ট বিকাল সাড়ে ৫-টায় ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারানির্যাতন ভোগের পর তিনি বগুড়া যেলা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমীরে জামা'আতের মুক্তিতে নেতা-কর্মী ছাড়াও সর্বস্তরের জনগণ মহান আল্লাহ্র বারগাহে শুকরিয়া আদায় করেন। তারা ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যাবাদীদের ধিক্কার ও নিন্দা জানান। আমীরে জামা'আতের মত একজন নিরীহ নিরপরাধ আলেমে দ্বীন ও খ্যাতিমান মনীষীর উপর বিগত জোট সরকারের জঘন্য মিথ্যাচার ও ন্যাক্কারজনক আচরণকে তারা বিগত যুগের ফির'আঊনী আচরণের সাথে তুলনা করেন। আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পর বিগত সরকারের সাজানো মসনদ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকেও একই পরিণতি বরণ করা স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নগদ দুনিয়াবী শাস্তি হিসাবে হয়েছে বলে মন্তব্য করে তারা বলেন, এ আর কিছু নয় স্রেফ মযলূমের দীর্ঘশ্বাসের ফল। নির্যাতিত মানবতার পক্ষে এলাহী প্রতিশোধ। এমনিভাবেই আল্লাহ অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যালেমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৪)*। সুতরাং যালেমদের দুনিয়াবী শাস্তি যাই হোক, পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং তা হবে অনেক কঠোর *(কলম ৬৮/৩৩)*।

রাবি আরবী বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর সাক্ষাৎঃ

আমীরে জামা'আত মুক্তি লাভের দ্বিতীয় দিন ২৯ আগষ্ট শুক্রবার সকাল ১১-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ব, বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ নকীবুল্লাহ, প্রফেসর মুহাম্মাদ আবূ বকর ছিদ্দীক, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আল-মাদানী, প্রফেসর ডঃ এস.এম. আব্দুস সালাম, সহযোগী অধ্যাপিকা শামীমা আখতারা, ডঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, ডঃ এ. ওয়াই. কে. এম. জাহাঙ্গীর, সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ ইকরামুল ইসলাম, ডঃ মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান, প্রভাষক মুহাম্মাদ সেতাউর রহমান ও মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান প্রমুখ আমীরে জামা'আতের সহকর্মীগণ কার ও মাইক্রোবাস যোগে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়ায় আসেন। শিক্ষকমণ্ডলী আমীরে জামা'আতের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আমীরে জামা'আত তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাবি ভাইস চ্যান্সেলর ও রেজিষ্ট্রারের সাথে আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎঃ

৩০ আগষ্ট শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মস্থল আরবী বিভাগে গমন করেন। সেখানে বিভাগীয় সহকর্মীদের সাথে কুশলবিনিময়ের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ শাফী-র সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং চাকুরীতে যোগদান পত্র জমা দেন। এরপর তিনি রাবির মাননীয় ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মামনূনুল কেরামতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর দফতরে গমন করেন। সেখানে তিনি ভিসি সহ উপস্থিত বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসরদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমীরে জামা'আতঃ

২৯ আগষ্ট শুক্রবার বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহর আমন্ত্রণে 'যুবসংঘ'-এর মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সাথে এক সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন।

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের কারাজীবন শেষে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত হয়ে এক আবেগঘন পরিবেশে আমীরে জামা'আত 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম ও কর্মপরিষদের সদস্যদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহতমূলক বক্তব্যে বলেন, এ দেশের বিপথগামী ছাত্র ও যুবসমাজকে নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাতলে জমায়েত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী গঠিত হয় নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এই অনন্য যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। যেকোন ধরনের শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা, চরমপন্থা ও ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে এই সংগঠন বিগত দিনে আদর্শ স্থানীয় হিসাবে কাজ করে এসেছে। আগামী দিনেও একই ভাবে শান্তিপূর্ণ পথে এই যুবকাফেলা এগিয়ে যাবে বলে আশা রাখি। তিনি বলেন, বাতিল দ্বারা প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত না হয়ে যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গঠনে যুবকরা এগিয়ে আসলেই সমাজের কাংখিত পরিবর্তন আসা সম্ভব। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে সচেতনতার সাথে দাওয়াতী ময়দানে কাজ করার আহ্বান জানান।

সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমীরে জামা'আতঃ

৩০ আগষ্ট শনিবার বাদ মাগরিব সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদের আমন্ত্রণে সোনামণি সংগঠনের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত সোনামণি কার্যালয়ে আগমন করেন এবং সোনামণি কর্মপরিষদের সাথে এক সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় সোনামণি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত শিশু-কিশোরদের মাঝে সঠিক ইসলামের দাওয়াত প্রসারের মাধ্যমে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য দায়িত্বশীলদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

আত-তাহরীক কার্যালয়ে আমীরে জামা'আতঃ

১ সেপ্টেম্বর সোমবার বাদ আছর আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর আমন্ত্রণে মাসিক **আত-তাহরীক**-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বর্তমান সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'আত-তাহরীক' কার্যালয়ে আগমন করেন এবং আত-তাহরীক এর কর্মকর্তাদের সাথে এক সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক জনাব শামসুল আলম, প্রুফ রিডার মুযাফফর বিন মুহসিন ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ। তিনি **'আত-তাহরীক'**-এর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং বিগত সাড়ে তিন বছরের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও **'আত-তাহরীক'**-এর প্রচার অব্যাহত থাকায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও দায়িত্বশীলদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন। তিনি বলেন, দেশে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দূরীভূতকরণ ও সুস্থ সাহিত্য বিকাশের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে **'আত-তাহরীক'**-এর যাত্রা শুরু হয়। জাতির সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শত বাধার সম্মুখীন হ'লেও সবকিছু ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আদর্শচ্যুত হওয়া যাবে না।

আমীরে জামা'আতের বগুড়া সফর

বগুড়া ৩১ আগষ্ট '০৮ রবিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া অতিরিক্ত যেলা দায়রা জজ আদালত-১ কর্তৃক ২৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় যামিনে মুক্তি লাভের পর অদ্য ৩১ আগষ্ট রবিবার উক্ত আদালতে প্রথম বারের মত হাযিরা দেওয়ার জন্য বগুড়া গমন করেন। মাইক্রোবাস যোগে তিনি সকাল ৮-টায় বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বেলা ১২-টায় হাযিরা শেষে আমীরে জামা'আত এ্যাডভোকেট চেম্বারে কিছু সময় বসেন এবং আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময় করেন। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘ ১৮ মাস কারা ভোগের পর সদ্য কারামুক্ত জনাব আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সালাম এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ ছাড়াও সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মী, সমর্থক এবং আদালতের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটবৃন্দ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

আনছার মাষ্টারের শয্যাপাশে আমীরে জামা'আতঃ আদালতে হাযিরা শেষে বেলা পৌনে ১-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি বেশ কিছুদিন থেকে গুরুতর অসুস্থ জনাব আনছার মাষ্টার (৫৫)-কে দেখতে তার নিজ বাসভবন বগুড়ার শাজাহানপুর থানার বৃ-কুষ্টিয়া গ্রামে গমন করেন এবং তার শয্যাপাশে বসে কুশল বিনিময় করেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সাশ্রু নয়নে প্রাণখোলা দো'আ করেন। অতঃপর উক্ত গ্রামে তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত মসজিদে তিনি যোহরের ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত উপদেশমূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন শুধুমাত্র জোরে আমীন বলা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করার আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলন পরিবার ও সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সাধনের আন্দোলন। তিনি বলেন, এ আন্দোলন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হ'লেও কখনো আদর্শচ্যুত হওয়া যাবে না। তিনি হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী বা গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ না করে সকল প্রকার দলাদলির উর্ধ্বে উঠে সকলের কাছে, এমনকি মানুষ হিসাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সহ সকল ধর্মের মানুষের নিকট এ মহান আন্দোলনের পবিত্র দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, এ সময় অত্র এলাকার প্রবীনতম কর্মী জনাব আব্দুর রহীম (১০৭) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জন্য তাঁর হাত ধরে কাতর কণ্ঠে দো'আ করেন।

উল্লেখ্য যে, আদালত প্রাঙ্গনে অবস্থানকালে জনাব আনছার মাষ্টারের গুরুতর অসুস্থতার কথা জানতে পেরে কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে পথপ্রদর্শক হিসাবে মাওলানা রামাযান আলীকে সাথে নিয়ে বৃ-কুষ্টিয়া গমন করেন। অসুস্থ কর্মীর প্রতি নেতার এই নিষ্কাম মমতা স্থানীয় সকলের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে রাজশাহী থেকে কপোতাক্ষ প্রভাতী ট্রেন যোগে সপরিবারে নিজ জন্মভূমি সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও একই সাথে কারাজীবনে ১৬ মাসের সাথী (২০০৫-০৬) এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা

পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম প্রমুখ।

যশোরে অভিনন্দনঃ বেলা সাড়ে ১২-টায় যশোর রেলষ্টেশনে পৌঁছলে যশোর যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানান। এ সময় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আমীরে জামা'আত যেলা সংগঠনের খোঁজ-খবর নেন এবং কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

সাতক্ষীরাবাসীর অভিনন্দনঃ আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরা থেকে যশোরে আগত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তাঁকে নিয়ে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যশোর থেকে আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গী হিসাবে যোগদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, অর্থ সম্পাদক মুযাফফর রহমান প্রমুখ।

সাতক্ষীরা গমনের পথে যশোরের ঝিকরগাছা, জামতলা, বাগআচড়া, সাতক্ষীরার কলারোয়া, ঝাউডাঙ্গা, কদমতলা, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার প্রভৃতি স্থানে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অগণিত মানুষ মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য যে, তাঁকে এক নযর দেখা ও মুছাফাহা করার অধীর আগ্রহে সকাল থেকেই জনসাধারণ অপেক্ষা করছিল। এদিকে আমীরে জামা'আতকে যশোরে বরণ করে নেওয়ার জন্য সাতক্ষীরাবাসীর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি থাকলেও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সীমিত করা হয়।

বিকাল সাড়ে ৩-টায় আমীরে জামা'আত নিজ জন্মভূমি সাতক্ষীরা সদর থানার বুলারাটি গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই গ্রামের জামে মসজিদে তিন পুত্রসহ নিজে ও সফর সঙ্গীগণ ছালাত আদায় করেন এবং মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে শায়িত তাঁর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের উদ্দেশ্যে দো'আ করেন। অতঃপর সকলকে নিয়ে আছরের জামা'আতে ইমামতি করেন।

আছরের জামা'আত শেষে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে আমীরে জামা'আত দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর নিজ গ্রামে পৌঁছতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর তাঁর মৃত পিতা ও বুযর্গ ওস্তায বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন মাওলানা আহমাদ আলীর জন্য প্রাণঢালা দো'আ করেন। অতঃপর যারা আহলেহাদীছ আন্দোলনের চরম দুর্দিনে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, বাড়ী-ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, সময়-শ্রম ও অর্থের কুরবাণী দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাঁর পিতা-মাতার রেখে যাওয়া শূন্য ভিটায় গিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর নিজ সহোদর বড় বোনের বাড়ীতে গমন করেন। গ্রামে এলে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। উল্লেখ্য যে, বড় বোন জামীলা খাতুন (৭৬) গত সাড়ে তিন বছর যাবত শয্যাশায়ী হয়ে ভাইয়ের মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন।

ছাত্র সমাবেশঃ আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষ্যে ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসা বাঁকালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, 'আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ'-এর সদস্য এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র আব্দুল্লাহ।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলঃ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে একই দিন বাদ আছর দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসা বাঁকালে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং যশোর সরকারী এম.এম. কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক কারা নির্যাতিত নেতা (২০০৫) জনাব গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রথমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর বলেন, আমরা সকল শ্রেণীর মানুষের দ্বারে দ্বারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন করি। কোন চরমপন্থী আন্দোলনে আমরা বিশ্বাসী নই। ইসলামের শান্তি পূর্ণ আদর্শ জনগণের নিকটে পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমাদেরকে কেন বিগত জোট সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, তা আমরা অবগত নই। জনসাধারণও জানে

না। সমাজের পথভোলা মানুষদেরকে স্বর্ণযুগের অভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলের দিকে তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানোই কি আমাদের অপরাধ? উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষ্যে হাযারো মানুষের ঢল ইফতার মাহফিলকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর জনগণ তাদের প্রাণপ্রিয় আমীরকে কাছে পেয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন ও মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দান অল্প সময়ের মধ্যেই কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের খবর পেয়ে তাঁর মুক্তির দাবীতে অত্র মাদরাসার ছাত্রগণ সাতক্ষীরা শহরে ব্যাপক পোস্টারিং করলে পুলিশ ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ দিবাগত রাতে মাদরাসা হ'তে ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে সাতক্ষীরা কারাগারে পাঠায় এবং ১৭ দিন পরে আদালতের নির্দেশে মুক্তি পায়। একইভাবে আমীরে জামা'আতের ভাগিনা চট্টগ্রামে টিএসপিতে দীর্ঘ দিন যাবত চাকুরীরত জনাব ছদরুল আনামকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে ৬টি মিথ্যা মামলা জুড়ে দেওয়া হয়। যার ৫টি প্রাথমিক তদন্তে খারিজ হয় এবং একটি আদালতে গৃহীত হয়নি। অবশেষে প্রায় সোয়া দু'বছর (৩.৮.২০০৫-২০.১২.২০০৭) কারাভোগের পর হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি চট্টগ্রাম কারাগার থেকে মুক্তি পান।

তাবলীগী সভা

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ বলেন, জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য তাবলীগের বিকল্প নেই। তিনি সূরা আছরে বর্ণিত জান্নাতীদের ৪টি গুণ উল্লেখ করে তাবলীগের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং যেলার সর্বস্তরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা ছানাউল্লাহ, ক্বারী মাওলানা ওবায়দুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, বাদ এশা একই স্থানে প্রধান অতিথি যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে এক দায়িত্বশীল বৈঠকে মিলিত হন।

কুমেদপুর, গাইবান্ধা ১ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কুমেদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হায়দার আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আবু হানীফ, অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, একই দিন বাদ আছর যেলার মুকন্দপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের কাজকে আরও গতিশীল করার জন্য সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক, মাসিক তাবলীগী ইজতেমা, নিয়মিত হাদীছ পাঠ ও বেশী বেশী তাবলীগী সফর করার পরামর্শ দেন।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৪ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফীউদ্দীন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ, দফতর সম্পাদক হাফেয মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান, মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম, মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মোখতার হোসাইন, মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, বাদ আছর প্রধান অতিথি যেলার কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

শীলমন্দী, নরসিংদী ১৫ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার শীলমন্দী এলাকার উদ্যোগে শীলমন্দী ইউনিয়ন কাউন্সিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংন্দী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোখতার হোসাইন প্রমুখ।

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ২২ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশিদপুর পূর্বপাড়া শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম শেখ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

দিনাজপুর ২ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে রাণীগঞ্জ ইসলামিয়া সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হক্ব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর প্রমুখ।

মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ঢাকা ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পাবলিক লাইব্রেরীর সেমিনার কক্ষে 'রামাযানের শিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হলের প্রভোষ্ট প্রফেসর আহমাদ জামাল আনওয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ রোকনুযযামান, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউরোলজী বিভাগের প্রধান ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সহ-সভাপতি ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনীরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদ, সঊদী আরবের দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুতীউর রহমান, কানাডার আল-কাউছার ইনস্টিটিউটের আমীর নাকীব আহসান খান, উম্মুল কুরা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা বশীরুদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরী প্রমুখ।

পাংশা, রাজবাড়ী ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও মেহেরপুর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্ম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়া করেন মুহাম্মাদ ঈমান আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ সেলিম মাহমূদকে আহ্বায়ক, মোল্লা তানজির রহমানকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন খাঁনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট রঘুনাথপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ এবং ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রূহুল আমীন এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান।

মান্দা, নওগাঁ ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে হুলিবাড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কালিকাপুর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মকবূল হুসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য মাস্টার মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন, দামনাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মাদ নিযামুল হক্ব ও মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র হাফেয আরীফুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করেন হুলিবাড়ি শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মঞ্জুর রহমান।

দড়িকমলপুর, কুষ্টিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দড়ি কমলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের পেশ ইমাম 'যুবসংঘে'র কর্মী মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন।

কিশোরীনগর, কুষ্টিয়া ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কিশোরীনগর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান, নাজীরুদ্দীন খাঁন, আব্দুর রাযযাক ও আব্দুল গাফফার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাস্টার। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী।

দূর্গাপুর, রাজশাহী ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দূর্গাপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে দূর্গাপুর ফাযিল মাদরাসা প্রাঙ্গনে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দূর্গাপুর পৌরসভার মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব সাঈদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, দূর্গাপুর ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আলতাফ হোসাইন, আলীপুর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তালেব, দূর্গাপুর পাইলট হাইস্কুল-এর প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন দূর্গাপুর ফাযিল মাদরাসার ছাত্র আব্দুল হক্ব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূর্গাপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবুল হুসাইন।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল, অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক আমীর হামযাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও অর্থ সম্পাদক মাওলানা মোখতার হোসাইন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, রামাযানের শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থানের কারণে আজ আমাদের এই দূরাবস্থা। তিনি আল-কুরআনের আলোকে চরিত্র গঠনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সত্য প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ববান ও আদর্শ মানুষ হয়ে সমাজকে আলোকিত

করতে হবে। সভায় শত শত নেতা-কর্মী ও সাধারণ মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

সাহারবাটী, মেহেরপুর ২০ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ এবং ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছুরুর রহমান, দক্ষিণাঞ্চলের আন্দোলন-এর সভাপতি মাস্টার আযমতুল্লাহ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মুছতফা।

যুবসংঘ

কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা

বংশাল, ঢাকা ৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে ঢাকার মাদরাসাতুল হাদীছ নাজিরা বাজার-এর দাওরায়ে হাদীছে ছাত্রদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী ফিচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা নিজ নিজ কর্মস্থলে থেকে আন্দোলনের কাজ করবেন এবং যে সকল যুবক নিজেদেরকে খাঁটি ইসলামী চরিত্রে গড়ে তুলতে এবং সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের আন্দোলনে অংশ নিতে প্রস্তুত, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করবেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফজলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, নাজিরা বাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম এবং বিদায়ী ছাত্রদের মধ্য থেকে মাওলানা মুখলেছুর রহমান (জামালপুর) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ হাফীযুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুর রাযযাক।

সাতক্ষীরা ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২০০৮ সালের এইচএসসি, আলিম ও ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রচলিত দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে মেধাভিত্তিক ছাত্র নেতৃত্ব গঠনে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে দলীয় হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে কঠোর অধ্যবসায়, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ এবং উন্নত চরিত্র গঠন করে দেশের ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজকে অবশ্যই কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ছাত্র ও যুবসমাজকে জমায়েত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে অদ্যাবধি যুবসংঘ বাংলার যমীনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ছাত্রদেরকে 'যুবসংঘ'-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থেকে দৃঢ়তার সাথে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, 'আহলেহাদীছ আইনজীবি পরিষদ' সাতক্ষীরা যেলার আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফূর, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ ইসরাঈল হোসাইন, ভারপ্রাপ্ত প্রচার সম্পাদক মাওলানা লুৎফর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুযাফফর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মনীরুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম ও বাঁকাল মাদরাসার ছাত্র বুরহানুদ্দীন। উল্লেখ্য, বাদ মাগরিব প্রধান ও বিশেষ অতিথি স্থানীয় দৈনিক 'দৃষ্টিপাত'-এর সম্পাদক জি.এম. নূর ইসলামের সাথে তার দফতরে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা যাবে কি?

-ইবরাহীম
ত্রিমোহনী, খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আলোকিত করা যায়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করা হ'লে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রচলিত 'আলোকসজ্জা' অবশ্যই অপচয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৭)*। অতএব যেকোন ধরণের অপচয় থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুল গফূর
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ সম্পূর্ণ মিথ্যা বা জাল। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'উক্ত হাদীছের সনদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৯৪-এর টীকা; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩)*। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা ছহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে, উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, তুমি লিখ। তখন সে বলল, আমি কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তুমি তাক্বদীর লিখ এবং সেটা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকা যাবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার শ্বশুর-শাশুড়ীকে কী বলে ডাকতেন? আমাদের এলাকায় বিবাহে যে ব্যক্তি উকীল হয় তাকে এবং তার স্ত্রীকেও আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সূরা আহযাবের ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় যায়েদ বিন হারেছাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুত্র এবং সালেমকে আবু হুযায়ফার পুত্র হিসাবে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেখানে মূলতঃ তাদেরকে প্রকৃত পুত্র বলে সম্বোধন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে *(মাওলানা জুনাগড়ী, উর্দূ তরজমা সহ তাফসীর, পৃঃ ১১৬৫)*। রূপকভাবে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রকৃত আব্বা-আম্মা না ভেবে রূপকভাবে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যেতে পারে *(ঐ, পৃঃ ২১৪, সূরা নিসা ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীকে কী বলে ডাকতেন তা জানা যায় না। বিবাহে উকীল থাকলে তাকে ও তার স্ত্রীকে আব্বা-আম্মা বলার প্রচলিত রেওয়ায ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ আমার বিবাহের সময় মোহরানা হিসাবে ১৫০০/= টাকা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী উক্ত মোহরানা ক্ষমা করে দিয়েছে। এক্ষণে আমি খুশি মনে ১২ কাঠা জমি মোহরানা শর্তে তাকে রেজিষ্ট্রি করে দিতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে শারঈ ফায়ছালা কি? জমি দিয়ে মোহরানা পরিশোধ করা যাবে কি?

-আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি কাউকে স্বেচ্ছায় মোহরানা মাফ করে দেয় তাহ'লে তাকে মোহরানার শর্তে স্থাবর বা অস্থাবর কোন বস্তুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই *(নিসা ৪)*। বরং সাধারণভাবে কিছু দিতে চাইলে দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির যে কোন বস্তু দিয়ে মোহরানা প্রদান করা যায়। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। এরপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহ'লে তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেন। তখন তিনি বললেন, মোহরানা স্বরূপ তোমার নিকট কিছু আছে কি? তখন সে বলল, আমার নিকট এ লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয় তাহ'লে তা দিয়ে মোহরানা দিয়ে দাও *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক মুষ্টি খাদ্য দিয়েও মোহরানা প্রদান করতাম *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১১০)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ সমাজের দরিদ্র শ্রেণী, যারা ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না, রামাযান মাসে ফিৎরা বণ্টনের সময় মসজিদ কমিটি তাদের জন্য নির্ধারিত ফিৎরা থেকে উক্ত বকেয়া চাঁদা (বেতন) কর্তন করে রাখেন। এভাবে বেতন বাবত ফিৎরা কেটে রাখা জায়েয আছে কি?

Contents

-মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
৬০, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ ফিৎরা বণ্টনের যে নির্ধারিত খাত রয়েছে সে খাতগুলি ব্যতীত অন্য খাতে বণ্টন করা এবং ফিৎরা বণ্টনের পূর্বে মসজিদের ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন বাবদ হকদারদের নিকট থেকে ফিৎরার টাকা কেটে নেওয়া শরী'আত সম্মত নয় *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৩৩)*। তবে ফিৎরা প্রদানের পর ফিৎরার টাকায় যখন তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মসজিদ কমিটি তাদের নিকট মসজিদের উক্ত চাঁদা দাবি করতে পারেন। তারা স্বেচ্ছায় প্রদান করলে কমিটি তা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ আমার আব্বা প্রতি বছর আজমীরে কিছু অর্থ দান করে থাকেন। কিন্তু আমি জনৈক আলেমের নিকট শুনেছি যে, আজমীর বা কোন মাযারে দান করা ঠিক নয়। তাহ'লে কোথায় দান করতে হবে?

-নাহিদ
২৫ নং ধোলাইখাল, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য দান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না *(বাক্বারাহ ২৭২)*। তাই শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত প্রতিষ্ঠান যেমন মাযার, খানকা, গির্জা, মন্দির ইত্যাদিতে দান করলে তা শিরক হবে। উল্লেখ্য, দান-খয়রাত সহ যাবতীয় ইবাদত হ'তে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, 'নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ১৬২)*। আল্লাহ তা'আলা দান করার ক্ষেত্র বর্ণনা করে বলেন, 'সম্পদ ব্যয় করতে হবে তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*। এছাড়া মসজিদ, মাদরাসা সহ অন্যান্য ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ আখিরাতে হিসাব-নিকাশের সময় ফরয ছালাতের ঘাটতি হ'লে নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করা হবে। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ডাঃ ক্বামারুযযামান সরকার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ফরয ছালাতের ঘাটতি থাকে তাহ'লে তার নফল ছালাত থাকলে তা দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করা হবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৪১৩)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ডান পা বাম পায়ের সামান্য সামনে রাখতে হবে। কথাটি কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?

-আসাদুল্লাহ
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ডান পা বাম পায়ের সামান্য সামনে রাখতে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে দাঁড়ানোর সময় আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী রাখতে হবে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২৬৬, 'ছালাতের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ কেউ যদি কুরবানী, ছাদাক্বা বা কোন পশু কারো দ্বারা যবেহ করে নেয়, তবে যবেহকারী এ জন্য কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে কি? যদি কেউ ইচ্ছা করে দেন তাহ'লে কি গ্রহণ করা যাবে?

-রুহুল আমীন
নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু যবেহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ তার গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে প্রাপ্য হিসাবে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*। তবে কুরবানী ব্যতীত অন্য পশু যবেহ করার বিনিময়ে তাকে মজুরী হিসাবে গোশত দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ কুরবানীর পশুর বয়স কত বছর হ'লে কুরবানী করা জায়েয? পশুর দুধের দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা কি শর্ত? অনেক ইমাম বলেন, কুরবানীর পশুর শিং এক মুষ্টি হ'লে কুরবানী করা জায়েয।

-আবুল হুসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর জন্য নির্ধারিত কোন বয়স নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবেহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫)*। জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছের নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন *(মির'আত ২/৩৫৩ পৃঃ)*।

কুরবানীর পশুর শিং এক মুষ্টি হ'লে কুরবানী করা জায়েয, একথার কোন ভিত্তি নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কানকাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা *(মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ 'নারায়ে তাকবীর' কোন ভাষার শব্দ? 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, দ্বীন ইসলাম যিন্দাবাদ' এই ধ্বনি দেওয়া জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ক্বাদের
স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ 'না'র (نعر) এবং তাকবীর (تكبير) উভয় শব্দই আরবী। 'নারায়ে তাকবীর' অর্থ তাকবীর ধ্বনি *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত, মিছবাহুল-লুগাত প্রভৃতি)*। 'নারায়ে তাকবীর' আরবী শব্দ হ'লেও উচ্চারণ করা হয় ফারসীতে। কারণ ফারসীতে মুযাফে যের হয়। 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি শরী'আত পরিপন্থী কোন ধ্বনি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতকালে মদীনায় পৌঁছলে এবং বদর যুদ্ধ ও তাবুক সফর থেকে বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরলে মুসলিমগণ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান *(দ্রঃ যাদুল মা'আদ ৩/৫২; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪২৮২ ও অন্যান্য)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ স্বর্ণ এবং রেশমের পোষাক পুরুষের জন্য কেন হারাম এবং মহিলাদের জন্য কেন হালাল হ'ল? এই বিধান কোন নবীর আমল থেকে চালু হয়েছে?

-শফীকুল ইসলাম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ স্বর্ণ এবং রেশমের পোষাক পুরুষের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ বৈষম্য কেন করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। এটা শরী'আতের বিধান। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এই দু'টি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। স্বর্ণের ব্যবহার সকল নবীর যুগে চালু ছিল *(দ্রঃ সূরা যুখরুফ ৭১; ফাৎহুবারী ৬/৪২০ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ এশার ছালাতের সময় ইমাম সূরা আর-রাহমান পাঠ করেন। ফাবি আইয়্যে আলা-ই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান বলার পর এক মুক্তাদী বললেন 'লা বেশাইইম মিন নি'আমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্‌দ'। সালাম ফিরানোর পর ইমাম ঘুরে বসে বললেন, ছালাতের মধ্যে উক্ত আয়াতের জওয়াব দিতে হয় না। অন্য সময় দিতে হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- আব্দুল মজীদ
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ছালাতের মধ্যে ও ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় উক্ত আয়াতের জওয়াব দান বাঞ্ছনীয় *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৬ হাশিয়া দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ মুসলিম ব্যতীত নিজেকে হানাফী, আহলেহাদীছ, মুহাম্মাদী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী বলে পরিচয় দেওয়া যাবে কি?

-মুসাম্মাৎ আনোয়ারা বেগম
পাকুড়িয়া ভেন্নাবাড়ী, পরীগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য প্রচলিত কোন মাযহাবী নামে পরিচয় দেওয়া বৈধ নয়। কারণ এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম ব্যক্তি নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২)*। আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে একজন মানুষের জন্য আসল পরিচয় হ'ল মুসলিম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পরপরই মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বহু বিদ'আতী ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে হক্বপন্থীগণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহলুস সুন্নাহ' নামে পরিচিত হয়ে আসছেন *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৮৮ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০; ছহীহ মুসলিম ১/১১ পৃঃ)*। এটা তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। সুতরাং হক্বপন্থী মুসলিমগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা আহলুল হাদীছ নামে পরিচিত হ'তে পারেন।

উল্লেখ্য যে, হাদীছ ও সুন্নাহর মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়ের বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছের মাধ্যমে লিখিত রূপ লাভ করেছে। হাদীছ ও ফিক্বহে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীছ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা আহলুল হাদীছ ছিলেন না, বরং তাদের তরীকার অনুসারী আম জনসাধারণও আহলুল হাদীছ নামে সকল যুগে কথিত হ'তেন বা আজও হয়ে থাকেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কী ও কেন?, পৃঃ ১০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ তারজী আযান কি ছহীহ হাদীছ সম্মত? এ আযানের নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
সমাজকল্যাণ বাজার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ তারজী আযান ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আযানের মধ্যে দুই শাহাদাত কালেমাকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে বলা এবং দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে তারজী বা পুনরুক্তির আযান বলা হয়। আবু মাহযূরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে সুন্নাতী আযান শিক্ষা দিন। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহু আকবার' উচ্চৈঃস্বরে ৪ বার বলবে। অতঃপর 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' ২ বার এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ২বার নিম্নস্বরে বলবে। অতঃপর আশহাদু আল্লা ইলা-হা থেকে আযানের শেষ পর্যন্ত শব্দগুলি উচ্চৈঃস্বরে বলবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ কোন্ প্রকার পিপীলিকা হত্যা করা বৈধ?

-নাঈমা বিনতে শামসুল হক
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানুষকে কষ্টদানকারী পিপীলিকা হত্যা করা বৈধ *(ফাৎহুলবারী ৬/৩৫৮১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন এক নবীকে একটি

পিপীলিকা কামড় দিলে তিনি পিপীলিকার বসতি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অহী করলেন যে, তোমাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিয়েছে, অথচ তুমি সব পিপীলিকাকে হত্যা করলে? সে পিপীলিকা কি তাসবীহ পাঠ করে না? *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১২২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে নিজের ছেলেকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার জন্য অছিয়ত করে যাননি। কিন্তু ছেলে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় সে তার পিতার জন্য হজ্জ করতে পারবে কি?

-মাওলানা আহমাদ আলী
হাট মাধনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা অছিয়ত করুক বা না করুক ছেলে তার মৃত পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে পারে। তবে ছেলেকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ আলী (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যকার যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছাহাবীগণের মধ্যকার উক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আমাদের চুপ থাকতে হবে। তারা একে অপরকে কাফের মনে করে লড়াইয়ে লিপ্ত হননি। কারণ তাদের অনেকেই 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই তাদের ব্যাপারে কুচিন্তা করা যাবে না। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বদরী ছাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত *(ছহীহ বুখারী হা/৩৯৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ একটি বিলের জমিতে পূর্বে বোরো ধানের চাষ করা হ'ত। বর্তমানে জমির মালিকদের সম্মতিতে প্রতি বিঘা জমির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের মূল্য পরিশোধের শর্তে মৎস চাষের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, পূর্বে ধান চাষ করে উৎপন্ন ফসলের ওশর আদায় করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে জমির মালিকেরা সরাসরি ধান পাচ্ছে না, বরং টাকা পাচ্ছেন। এখন তারা কিভাবে ওশর আদায় করবে?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তরঃ জমি হ'তে উৎপাদিত ফসলের ওশর দিতে হয়। কিন্তু উক্ত জমিতে শস্য উৎপাদন না করে যেহেতু মাছ চাষের জন্য বর্গা দেওয়া হয়েছে সেহেতু তার ওশর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বর্গা দেওয়ার বিনিময়ে উক্ত জমি হ'তে যে অর্থ পাওয়া যায় তা যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয় তাহ'লে উক্ত টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ খালাতো ভাইয়ের সাথে বিধবা খালাতো বোন হজ্জে যেতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ হাসান
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ খালাতো ভাই মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিধায় উক্ত মহিলা তার খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে হজ্জ সহ কোন সফরে যেতে পারবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি নির্জনে কোন মহিলার সাথে মিলিত হ'তে পারে না এবং কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষের সঙ্গে সফর করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ কোন মুছল্লীর রক্তশূন্যতা দেখা দিলে বেনামাযী বা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি? উক্ত রক্ত গ্রহণ করে ইবাদত করলে কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
রামনগর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রয়োজনে রক্ত গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফারমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(বাক্বারাহ ১৭৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ ফাযিল ১ম বর্ষ আল-ফাতাহ গাইড সিরিজের আক্বাইদ বইয়ের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে আবুল হাসান আল-আশ'আরী মু'তাযিলা দল ত্যাগ করে বছরার এক মসজিদে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে এক মাযহাবের সূচনা করেন। উক্ত মাযহাবের অনুসারীরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে পরিচিত। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হামিদুল ইসলাম
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্পর্কে উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এর পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ৫ম হিজরী শতকের ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল আম জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন' *(কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ১/৩৭১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, আবুল

Contents

হাসান আশ'আরী ৩০০ হিজরীতে তাঁর পূর্বের 'আশ'আরী মতবাদ পরিত্যাগ করে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কবুল করেন এবং ৩২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন *(ঐ, আল-ইবানাহ, ভূমিকা, পৃঃ ৭-১১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ যোহরের দুই রাক'আত ছালাত হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ জামা'আতে শরীক হয় তাহ'লে ইমামের সাথে পাওয়া বাকী দুই রাক'আত তার জন্য প্রথম বলে গণ্য হবে, না কি শেষ বলে গণ্য হবে। যদি প্রথম হয় তাহ'লে ইমামের সাথে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। অন্য সূরা কি পড়তে হবে?

-মুফাযযল ও ফরিযুল
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমামের সাথে পাওয়া রাক'আত প্রথম রাক'আত বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় ইমামের সাথে যতটুকু পাওয়া যাবে ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। তাই শুধু সূরা ফাতিহা পাওয়া গেলে শুধু ফাতিহাই পড়তে হবে। কারণ ইমামকে নিযুক্ত করা হয় আনুগত্য করার জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ পাপ ও অপরাধ কি একই জিনিস?

-আমীনুল ইসলাম
কমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আভিধানিক অর্থে দু'টি শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। যেমন ছালাত ছেড়ে দেওয়া এক প্রকার অপরাধ এবং তা বিরাট পাপও বটে। আবার অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যেমন অপরাধ তেমনি পাপও।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ মালাকুল মউত-এর নাম কি আযরাঈল?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বিভিন্ন গ্রন্থে মালাকুল মউত-এর নাম 'ইযরাঈল' (عِزْرَائِيْل) বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(মিছবাহুল লুগাত, ফিরোযুল লুগাত)*। আযরাঈল নয়। তবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উক্ত নামের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং 'মালাকুল মউত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(সূরা সাজদাহ ১১ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ যে সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে নির্দিষ্টভাবে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে তাদের নামগুলি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবুবকর
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে যাদেরকে নির্দিষ্ট করে জাহান্নামী বলা হয়েছে তারা হ'ল, আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামীল উরউয়া *(সূরা লাহাব)*। হাদীছে যাদের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তারা হ'ল, আবু ত্বালিব ইবনে আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং আমর বিন আমের বিন লুহাই আল খুযাঈ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৮; ফাতাওয়া উছায়মীন ৫/৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ ভয় লাগা কিংবা অন্য কোন জটিল সমস্যায় তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই তাবীয ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলাল সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২, ১/৮০৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদের স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ আমার ঘাড়ে সুতা দেখে বললেন, এটা কি? আমি বললাম, 'সুতা' যা আমাকে পড়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি তা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ্র বংশধর। তোমরা অবশ্যই শিরক হ'তে মুক্ত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। সাঈদ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবীয কেটে দিল, সে গোলাম আযাদ করার নেকী পেল *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ফাতাওয়া উছায়মীন ৯/১৭৯)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম তারা ফিদইয়া হিসাবে প্রতিটি ছওমের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এখানে মিসকীন বলতে কেমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

-আব্দুল বাছীর
বায়া বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যার কাছে সংসার পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই তাকেই মিসকীন বলা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর কিংবা এক লোকমা অথবা দুই লোকমা খাবার দিয়ে বিদায় করা হয়। বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে মানুষের কাছে কিছু চায় না এবং অনুধাবনও করা যায় না যে, তাদেরকে দান করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৩১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ কোন বিপদের কারণে যদি আছরের ছালাত মাগরিবের আগে পড়া না হয় তাহ'লে পরের দিন আছরের সময়ে পড়া যাবে কি?

-হাসান মুন্সী
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। ঘুমিয়ে গেলে বা ভুলে গেলে ঘুম ভাঙ্গলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির ছালাত ঘুমের কারণে অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে ছুটে যাবে তার কাফফারাহ হ'ল যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নেবে'। অন্য বর্ণনায় আছে, উহা ব্যতীত এর অন্য কোন কাফফারাহ নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩-৬০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ ইরান দূতাবাস, ঢাকা থেকে প্রচারিত বুলেটিনে (৩০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মে-জুন ২০০৮) 'স্মরণীয় বাণী' শিরোনামে কিছু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যার মধ্যে একটি এরূপ যে, যখন ক্বিয়ামত উপস্থিত হবে এবং জাহান্নামের অগ্নিপার্শ্বে পুলছিরাত

টাঙানো হবে তখন শুধু যার সাথে আলী (রাঃ)-এর পত্র থাকবে সে ছাড়া কারো তা পার হবার অনুমতি থাকবে না (আল-মানাকিব ইবনুল মাগাযেলী, পৃঃ ১৪২, ১৮৯)। এ সম্পর্কে জানতে চাই।

- শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রথমতঃ অত্র বুলেটিনটি শী'আ সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত। আক্বীদা-বিশ্বাসগত ভাবে শী'আ সম্প্রদায় একটি ভ্রান্ত ফেরকা। হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুসারী হবার দাবীদার এই দলটি রাজনৈতিক কারণে জন্মলাভ করলেও পরবর্তীতে তারা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাদের বিশ্বাস ও কর্মসমূহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়। সেকারণ দ্বীন সম্পর্কিত তাদের বক্তব্যসমূহ আহেল সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট পরিত্যাজ্য। প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্যটি শী'আ সম্প্রদায়ের রচিত একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই। মূলতঃ পুলছিরাত হ'ল জাহান্নামের উপর স্থাপিত জান্নাত অভিমুখী একটি সেতু। হাশরের দিনে মানবজাতিকে এই সেতু অতিক্রমের নির্দেশ দেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ 'তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অবধারিত সিদ্ধান্ত' *(মারিয়াম ১৯/৭১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটি এমন একটি স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। যেখানে রয়েছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা যা দেখতে নজদের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায়। মুমিনগণ কেউ কেউ এ পথ চোখের পলকে অতিক্রম করবে, আবার কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ দূরন্ত ঘোড়ার গতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে এ পথ পার হ'তে থাকবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আবার কেউ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাত পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অনেকে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। মুমিনগণ পরিশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে *(মুসলিম হা/২৬৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'মহান আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের পথ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, প্রত্যেকেই স্বীয় আমল অনুযায়ী দ্রুতগতিতে বা ধীর গতিতে এ পথ অতিক্রম করবে (নতুবা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে) *(তিরমিযী, হা/৩০৮৪, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা মারিয়ামের তাফসীর' অনুচ্ছেদ, আলবানী একে ছহীহ বলেছেন)*। বুখারী ও মুসলিমে মারফু' সূত্রে অনুরূপ আরো বর্ণনা এসেছে।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে তা সাথে সাথে বন্ধ করা যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে তা বন্ধ করা যাবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু মারার নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছালাত রত অবস্থায় ছালাতে বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ প্রতিহত করা যায়। অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজা বন্ধ করে নফল ছালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি দরজায় এসে শব্দ করলে তিনি আমাকে দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় ছালাতে ফিরে গেলেন। দরজা ছিল ক্বিবলার দিকে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ দুনিয়াতে কতজন ছাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন?

-আব্দুছ ছবূর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবীদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে ১০ জন আশারায়ে মুবাশশা নামে খ্যাত। তারা হ'লেন, (১) আবুবকর ছিদ্দীক্ব, (২) ওমর, (৩) ওছমান, (৪) আলী, (৫) ত্বালহা, (৬) যুবায়ের, (৭) আব্দুর রহমান বিন আওফ, (৮) সা'দ ইবনু আবি ওয়াককাছ, (৯) সাঈদ ইবনু যায়েদ এবং (১০) আবূ উবায়দাহ ইবনুল জারাহ (রাঃ) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৩০৯)*। এছাড়া উককাশাহ ইবনু মিহছান (রাঃ)ও দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬)*। এছাড়াও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীকেও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত *(বুখারী হা/৩৯৮৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ হিন্দু ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিদের দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-লুবাব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ হিন্দু ধর্ম পালনকারীদের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে ইহুদীর বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছেন। সেখানে নবী করীম (ছাঃ)-কে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত দেওয়া হয়েছিল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে হিন্দুরা যেহেতু আল্লাহ্‌র নামে যবহে করে না, সেহেতু তাদের যবহেকৃত গোশত খাওয়া যাবে না *(মায়েদাহ ৩)*। অন্যান্য খাদ্য 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে পারবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগকারী কি কাফির? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে কী পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবেন?

-মুহাম্মাদ শামসুযযামান
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত তরককারীকে কাফির হিসাবে গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। উল্লেখ্য যে, অলসতাবশে যারা ছালাত ত্যাগ করে তারা বড় অপরাধী। কিন্তু যারা ছালাতকে অস্বীকার করে তারা কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ সুন্নাত বা নফল ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতা ডাকলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। এ কথা কি ঠিক?

-শামীমা খাতুন
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। বাণী ইসরাঈলের মাঝে জুরাইজ নামে একজন আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার ইবাদত খানায় ছালাতে ব্যস্ত থাকতেন। একদা তিনি নফল ছালাতরত অবস্থায় তার মা তাকে ডাকলে তিনি মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে ছালাতে ব্যস্ত ছিলেন। এভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার মা তাকে বদদো'আ করলে সে বদদো'আ তার উপর লেগেছিল *(মুসলিম, হা/৬০০৯ 'পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় যে, সুন্নাত-নফল ছালাত ছেড়ে দিয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া ছালাতের স্থান বাড়ানোর জন্য মসজিদের পিলারের ফাঁকে ফাঁকে ২/১ কাতার বাড়ানো যাবে কি? উল্লেখ্য, মসজিদের জায়গা বাড়ানো কোন সুযোগ নেই।

- রাজীব সিদ্দিকী
ধানমণ্ডী, ঢাকা।

উত্তরঃ মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে নিরুপায় অবস্থায় পিলারের ফাঁকে কাতার বৃদ্ধি করে সাময়িক ছালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে নিয়মিতভাবে পিলারের মাঝে কাতার করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে না। কারণ এতে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় *(আবুদাঊদ হা/৬৭৩)*। এমতাবস্থায় মসজিদ স্থানান্তর বা দোতলা করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ আপন শ্যালিকার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্ত্রী হারাম হবে কি?

-আযীযুল হক্ব
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রী থাকাবস্থায় আপন শ্যালিকার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এরূপ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তার উপর শারঈ বিধান অনুযায়ী সরকারীভাবে হদ্দ জারি করা আবশ্যক। তবে এ কারণে স্ত্রী হারাম হবে না *(ছহীহ বুখারী, তরজমাতুল বাব ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ সরকারী কর্মচারীরা অবসর অন্তে তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও সরকার প্রদত্ত অবসর ভাতার সমস্ত পাওনা আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা একবারে সূদবিহীন তুলে নেয়। কিন্তু আমার সংশয় এখানেই যে, আজীবন পেনশন নিতে ইচ্ছুক কর্মচারীরা অবসর ভাতার ৫০% টাকা না তুলে সরকারী কোষাগারে রেখে দেন। তিনি মারা গেলে তার জীবিত স্ত্রী ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর নাবালক ছেলে-মেয়ে থাকলে তারা পর্যায়ক্রমে তা কমপক্ষে ২০/৩০ বৎসর যাবৎ পেতে থাকে। যা জমাকৃত টাকার চেয়ে বহুগুণে বেশী। এছাড়া লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন। এই অতিরিক্ত টাকা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-নূরুল হুদা
সিনিঃ সহঃ শিক্ষক
রিভারভিউ হাই স্কুল, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী যদি তার অবসর ভাতার ৫০% তুলে নেয় এবং অবশিষ্ট ৫০% পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন ভোগ করার জন্য রেখে দেয় তাহ'লে তা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সে যে পরিমাণ টাকা জমা রাখে তার চেয়ে অতিরিক্ত ভোগ করে লাভ-লোকসানের কোনরূপ ঝুঁকি ছাড়াই। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান হারে, নগদ-নগদ। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দিল বা গ্রহণ করল তা সূদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল, আর দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। তবে নিজস্ব টাকা জমা রাখা ব্যতীত সরকারের পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেনশন হিসাবে যা প্রদান করা হয় তা সূদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ কারো প্রাথমিক জীবনের কয়েক বছরের ছেড়ে দেওয়া ছালাত পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে কি?

- আব্দুল ওয়াহীদ
তাজপুর, সিলেট।

উত্তরঃ কেউ প্রাথমিক জীবনে ছালাত ছেড়ে দিলে সে যখন ছালাত আদায় শুরু করবে তখন তাকে কথিত উমরী ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ অতীতে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ছালাত সে ছেড়ে দিয়েছে তা যদি হাযার বারও আদায় করে তা তার জন্য কোন কাজে আসবে না। ইসলামে এ ধরনের কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম, 'ফায়সালা' অধ্যায়, হা/৪৪৯৩)*। বরং তার জন্য করণীয় হ'ল, আল্লাহ্র নিকটে বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করা এবং অধিক পরিমাণে নফল ছালাত আদায় করা। কারণ তওবা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। আর তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মত।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ ধূমপান করার কারণে এক ব্যক্তিকে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ আলিম-ওলামা তামাক-জর্দা সেবনকারী হওয়া সত্ত্বেও সসম্মানে ইমামতি করছেন। ধূমপান ও তামাক-জর্দা সেবন করা কী ধরনের অপরাধ?

- রাজীব ছিদ্দীক্বী
৯২/বি. ধানমণ্ডী, ঢাকা-১২০৯।

উত্তরঃ ধূমপান, তামাক ও জর্দা একই প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য। যা পরিষ্কার হারাম। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের উপরে পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের নেশাদার দ্রব্যকে হারাম করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। অতএব কারো জন্যই নেশাদার দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। সেকারণ এ জাতীয় দ্রব্য সেবনকারী কোন ব্যক্তিকে ইমাম বা মুওয়াযযিনের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া উচিত নয়।